ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ

ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ
আড়াইহাজারী

মাকতাবাতুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বাণী

قال ابن عمر حين حضرته الوقاة ماسى على شئ من الدنيا الاعلى ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وانى لم اقاتل هذه الفئة الباغية التى نزلت بنايعنى الحجاج

হযরত ইবনে উমর (রা.) মৃত্যুকালীন সময় ইরশাদ করেন, দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্য আমার আফসোস হচ্ছে না। তবে শুধু আফসোস হচ্ছে গরমের ঐ সমস্ত দিন যা রোযাবিহীন অতিবাহিত হয়েছে এবং রাতের ঐ সময় যা ইবাদত ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে। আর হিজাজে আত্মপ্রকাশকারী বাগী দমনের সুযোগ আসার পর যে সময়টুকু তাদের সাথে জিহাদ ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে।

সূচিপত্র

বিষয়	নাম্বার
৪. তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারী	৫৬
তাহাজ্জুদ অন্ধকার কবরের নির্জনতা দূর করে	৫৭
১. প্রচণ্ড গরমের দিন রোযা রাখা	৫৮
২. রাতের অন্ধকারে নামায আদায় করা	৫৮
৩. হজ্জ আদায় করা	৫৯
৪. দান-সদকা করা	৫৯
তাহাজ্জুদের জন্য পানি ছিটিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত করা	৬০
তাহাজ্জুদকারীগণ যাকেরিনদের অন্তর্ভুক্ত	৬১
তাহাজ্জুদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারকে গুরত্ব দেয়া	৬২
তাহাজ্জুদের জন্য দাউদ পরিবারকে উঠিয়ে দেয়া	৬২
তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করা	৬৩
১. আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ	৬৫
২. গুনাহের কাফ্ফারা হওয়া	৬৫
৩. নাফরমানী থেকে হেফাজত রাখে	৬৬
৪. হিংসার মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা	৬৬
ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের নামায অপেক্ষা উত্তম	৬৬
তিন অবস্থায় দু'আ ব্যর্থ হয় না	৬৭
প্রথম ক্ষেত্র	৬৮
দ্বিতীয় ক্ষেত্র	৬৮
তৃতীয় ক্ষেত্র	৬৮
তাহাজ্জুদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের অমূল্য বাণী	৬৮
হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বাণী	৬৯
হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বাণী	৭০
হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বাণী	৭০
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাণী	৭০
হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর বাণী	৭১
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাণী	৭১

বিষয়	নাম্বার
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাহাজ্জুদ	৭৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পা মুবারক ফুলে যেত	৭৪
তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে যিকির করা	৭৬
কালামের পাকের তিলাওয়াত	৭৭
দু'আ-দরূদের মাধ্যমে যিকির করা	৭৮
হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনা	৭৮
হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা	৭৮
ক্ষমার অপর এক দু'আ	৭৯
হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ননা	৭৯
সাহাবায়ে কিরামের তাহাজ্জুদ	৮০
হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮১
হযরত উসমান গনি (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮২
হযরত আনাস (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৪
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৪
হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৪
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৫
হযরত আবু যর (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৫
হযরত উমর ইবনে আতবা (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৫
হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৬
হযরত কাহমাসুল হেলালী (রা.)	৮৬
হযরত তামীম ইবনে আউস (রা.)-এর তাহাজ্জুদ	৮৭
হযরত মিদাদ ইবনে আমর (রা.)	৮৭
আকাবিরগণের তাহাজ্জুদ	৮৭
পঞ্চাশ বছর ইশার অযুতে ফযর নামায আদায়	৮৮
চল্লিশ বছর ইশার অজুতে ফযর নামায আদায়	৮৮
এক হাজার রাকা'আত নফল আদায়	৮৯
সারা রাত্রি দু'আতে অতিবাহিত করা	৯০

বিষয়	নাম্বার

পবিত্র কালামে পাকে তাহাজ্জুদ

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, সভ্যতার ক্রমবিকাশে, বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনে পবিত্র কুরআন যে ভূমিকা রেখেছে তা অতুলনীয়। মানুষের মনের জগতে, চিন্তার জগতে কুরআন অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টির সেরা, স্রষ্টার প্রতিনিধি, আশরাফুল মাখলুকাত যখন জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আপন স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে নিজ হাতে গড়া প্রতিমাগুলোর সামনে মাথা ঝুকাচ্ছিল, মাথা নত করছিল, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারাসহ বিভিন্ন মাখলুকের সামনে, কুরআন তার অমিয় বাণী শুনিয়ে শুধু তাদেরকে অপাত্রে মাথা ঝুকানো থেকে বিরতই করেনি; বরং গভীর রজনীতে একাকী দাঁড়িয়ে মা'বুদে হাকীকির সামনে মাথা নত করায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতা অপরিহার্য প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত প্রেমিক হওয়া এবং ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ লাভের পন্থা হলো তাহাজ্জুদ– যা সকল আম্বিয়া, আসহাবে রাসূল ও বুযুর্গানে দীন আদায় করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে নীরবে অশ্রু ত্যাগ ও তাহাজ্জুদ ব্যতীত কেউ খোদাপ্রেমের পরিচয় দিতে পারেনি। কুরআন এ তাহাজ্জুদের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত দ্বারা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

তাহাজ্জুদের পুরস্কার

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

তরজমা.

'হে রাসূল! রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। এটা আপনার একটি অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাকামে মাহমুদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।'

-সূরা বনী ইসরাইল-৭৯

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাস করা হল, ফরযের পর কোন নামায সর্বোৎকৃষ্ট ? উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন, রাতের নামায যাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। রাতে কিছু সময় নিদ্রার পর জাগ্রত হয়ে যে নামায আদায় করা হয়।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সারা জীবনের অভ্যাসই ছিল, তিনি রাতের শুরু অংশে কিছু সময় নিদ্রা যেতেন, পরে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।

প্রিয়নবী (সা.) ও উম্মতের উপর তাহাজ্জুদের বিধান

আল্লামা কান্দলভী (রহ.) বর্ণনা করেন, ইসলামের শুরুলগ্নে সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। পরে উম্মতের উপর থেকে তা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধানের ক্ষেত্রে তিনি দু'টি মত প্রকাশ করেছেন।

এক. উম্মতের উপর থেকে তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এক বিশেষ ফরয হিসাবে সাব্যস্ত ছিল।

দুই. তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত উম্মতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও রহিত হয়েছিল। তবে হ্যাঁ! তা ছিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য উচ্চ মর্যাদা লাভের বিশেষ উপকরণ। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, তাহাজ্জুদের নামায শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরই ফরয ছিল, কখনো তা উম্মতের উপর ফরয হয়নি।

আল্লামা ইমাম রাজী (রহ.) বর্ণনা করেন, তাহাজ্জুদের নামায একটি বাড়তি কর্তব্য ছিল শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য, উম্মতের জন্য তা কোন বাড়তি কর্তব্য নয়। কারণ উম্মতের গুনাহ মাফ করানোর জন্য চাই নফল ইবাদত। ফরযের দ্বারা তো দায়িত্ব আদায় হল ও গুনাহ থেকে বাঁচা গেল। অধিক মাগফিরাতের জন্য চাই ফরযের সাথে অধিক নফল ইবাদত। তাই উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদকে নফল করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেহেতু কোন প্রকার গুনাহ নেই তাই তাঁর জন্য এটি একটি বাড়তি কর্তব্য।

যাদের নিকট তাহাজ্জুদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বদা ফরয, কখনো রহিত হয়নি তারা দলিল উপস্থাপন করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

আমার জন্য তিনটি বিষয়কে বিশেষ ফরয হিসাবে প্রদান করা হয়েছে যা তোমাদের জন্য সুন্নাত। ১. বিতিরের নামায আদায় করা। ২. মিসওয়াক করা। ৩. মধ্যরাতের তাহাজ্জুদ নামায পড়া।

তাহাজ্জুদের নামায প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নফল হওয়ার প্রমাণ মিলে হযরত মুগীরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে। তিনি বলেন, দুজাহানের বাদশাহ সায়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিবেলা আহকামুল হাকীমিন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এত অধিক পরিমাণ দণ্ডায়মান থাকতেন যে তাঁর কদম মুবারকে রস-পানি জমে যেত, কদম মুবারক ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত। রাহমাতুলল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা তো আপনার অগ্র-পশ্চাতের সকল কিছু মাফ করে দিয়েছেন। তথাপি আপনার এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি কি আল্লাহ

তা'আলার শোকরগুজার বান্দা হবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, আমার উপর রাত্রিকালীন নামাযকে ফরয করা হয়েছে।

সারকথা হল, তাহাজ্জুদের নামায উম্মতের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ নামায আদায় করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা আসল যে, সে ব্যক্তি সর্বদা সকাল পর্যন্ত ঘুমায় কোনদিন তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করলেন, তার কানে শয়তান পেশাব করে। যদি উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা না হতো তবে তা পরিত্যাগকারীর জন্য এত কঠোর মন্তব্য হতো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাহাজ্জুদের পরিমাণ

উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গায়রে রমযান সব সময়ই রাতে এগার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। প্রথম চার রাকা'আত অত্যন্ত সুন্দর ধীর স্থির ও কল্পনাতীত দীর্ঘ করতেন। এরপর চার রাকা'আতও অনুরূপ আদায় করতেন। এরপর তিন রাকা'আত আদায় করতেন। হযরত আয়শা (রা.) বলেন, একদা আমি আরয করলাম– ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি বেতের আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আয়শা! আমার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু অন্তর নয়। -বুখারী ও মুসলিম শরীফ

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে তের রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তাতে বেতের ও ফজরের দুই রাকা'আত অন্তর্ভুক্ত থাকতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহে রাত্রি যাপন করছিলাম। তখন লক্ষ করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত

হলেন, মিসওয়াক করলেন অতঃপর, ان فى خلق السموت والارض থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন, অযু করে নামাযে দণ্ডায়মান হলেন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। যার মাঝে দণ্ডায়মান অবস্থা, রুকু, সিজদা অনেক দীর্ঘ ছিল। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঘুমিয়ে গেলেন। সে ঘুম এতই গভীর ছিল যে, তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শ্রুত হতে লাগল। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে পুনরায় পূর্বের ন্যায় নামায আদায় করলেন। এভাবে তিনবারে ছয় রাকা'আত নামায আদায় করলেন। প্রত্যেকবার উঠে মিসওয়াক করতেন, অযু করতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। সর্বশেষ তিন রাকা'আত বিতির নামায আদায় করতেন। -মুসলিম শরীফ

হযরত হোযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি সর্বপ্রথম তিনবার আল্লাহু আকবার বলেন, এরপর–

دوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة পাঠ করেন, অতঃপর নামায শুরু করেন এবং প্রথমেই সূরায়ে বাকারা পাঠ করেন, তারপর রুকু করেন। যে পরিমাণ সময় দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন প্রায় সে পরিমাণ সময় রুকুতে ছিলেন। এসময় لربى الحمد পাঠ করেন। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থার সমপরিমাণ দীর্ঘ সিজদা করেন। সিজদাতে سبحان ربى الاعلى পাঠ করেন। দুই সিজদার মধ্যে সিজদা সমপরিমাণ সময় উপবিষ্ট থাকেনএবং এ অবস্থায় পাঠ করেন–

رب اغفرلى رب اغفرلى এভাবে চার রাকা'আত নামায আদায় করেন।

এ রাকা'আতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে আল-ইমরান, সূরায়ে নিসা ও সূরায়ে মায়েদা বা সূরায়ে আন'আম। -আবু দাউদ শরীফ

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন ঠিক সে পরিমাণ সময়

নামাযে অতিবাহিত করতেন। রাত্রি বেলা কিছু সময় বিশ্রাম করতেন, পুনরায় নামায আদায় করতেন। এভাবে সকাল হয়ে যেত।

-আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফ

উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারক যখন ভারী হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি রাতের বেলা অনেক সময় বসে নামায আদায় করতেন।

মাকামে মাহমুদ

আল্লামা আহমদ ইবনে আবী হাতেম ও সাহেবে তিরমিযী (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে একটি হাদীস সংকলন করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- মাকামে মাহমুদ হল সেই স্থান যেখান থেকে আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। সংক্ষিপ্তভাবে মাকামে মাহমুদ হল প্রশংসিত স্থান। প্রশ্ন হল প্রশংসিত স্থান কি? এর উত্তরে বলা হল, তা হল সর্বশ্রেষ্ঠ শাফা'আতের স্থান। কিয়ামতের দিন যখন আম্বিয়ায়ে কিরাম পর্যন্ত অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকবেন তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজী পেশ করার সাহস কারোই থাকবে না। সে কঠিন সংকটময় মুহূর্তে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে মহান আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবেন একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেদিন সকলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করবেন। এটিই হল মাকামে মাহমুদ। এটি হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সর্বশ্রেষ্ঠ শাফা'আত

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) বর্ণনা করেন, দুনিয়ার মানুষ তিনবার শাফা'আত প্রার্থী হবে।

১. কিয়ামতের ময়দানে যখন সমস্ত মানুষ বিচারের জন্য আটকা থাকবে তখন মুক্তিলাভের জন্য সুপারিশের মুখাপেক্ষী হবে।

২. জান্নাতে প্রবেশের জন্য শাফা'আতের মুখাপেক্ষী হবে।

৩. দোযখ থেকে গুনাহগার মুমিনদের মুক্তির জন্য শাফা'আতের প্রয়োজন হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার প্রতিপালকের সম্মুখে আমাকে তিনবার শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি আমাকে প্রদান করেছেন।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লেখ করেন, শাফা'আত তিনবার হবে। তবে সে শাফা'আতের স্থান হবে একটি সে স্থানটিকেই মাকামে মাহমুদ বলে। তিনটি শাফা'আতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হবে হাশর মাঠের শাফা'আত যার বর্ণনা দিয়ে হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিন হাশরবাসী মুসলমানদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হবে যে, আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কেউ সুপারিশ করুক। আর সে সুপারিশের কারণে আল্লাহ তা'আলা হাশর মাঠের এ মহা মসিবত থেকে আমাদের মুক্তি দান করুক।

এ লক্ষ্যে লোকেরা একত্রিত হয়ে হযরত আদম (আ.)-এর খেদমতে আরয করবে, হে আদম (আ.)! আপনি আমাদের আদিপিতা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বহস্ত মুবারকে তৈরি করেছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। ফিরিশতাদের মাধ্যমে আপনাকে সিজদা করানো হয়েছে অতঃপর আপনি আমাদের এ স্থান থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

হযরত আদম (আ.) বলবেন, আমি সে অবস্থায় নেই যে তোমাদের কোন উপকার করতে পারি। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধ আমার দ্বারা হয়েছে এবং তা এখন স্মরণ হচ্ছে। তোমরা বরং হযরত নূহ (আ.)-এর নিকট যাও। তুফানের পর তিনিই পয়গাম্বর ছিলেন যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সর্বধিক ক্রন্দনকারী সে নবীর কাছে যাও। লোকেরা হযরত নূহ (আ.)-এর নিকট গমন করবে। হযরত নূহ (আ.) বলবেন, আমি এখন সে অবস্থায় নেই। আমার স্মরণ হচ্ছে, আমি আমার কাফের পুত্রের না াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দরখাস্ত করেছিরাম। তোমরা বরং হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আ.)-এর নিকট যাও। সকলে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর নিকট যাবে

তিনি তাদের বলবেন, আমার এখন সে অবস্থা নেই যে, আমি তোমাদের জন্য শাহী দরবারে সুপারিশ করবো। আমার স্মরণ হচ্ছে ঐ সমস্ত কথা যা আমি বলেছিলাম মিশরের বাদশাহর সামনে। (হযরত সা'আরাকে নিজের বোন বলা।) আরো স্মরণ হচ্ছে সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মেলায় অংশগ্রহণ না করার জন্য সুস্থ থাকা অবস্থায় অসুস্থ বলা। মূর্তিগুলোকে নিজ হাতে ভেঙ্গে বলেছি, তোমাদের বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞাস করো। তোমরা বরং হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট যাও। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাওরাত দান করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য-ধন্য করে সম্বোধন করেছেন। সকলে হযরত মুসা (আ.)-এর দরবারে যাবে। তিনি বলবেন, আমি সে অবস্থায় নেই যে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবো। কারণ, স্মরণ হচ্ছে সে দিনের কথা যে দিন, আমি ভুলক্রমে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তোমরা বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যাও। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, রূহুল্লাহ এবং কালিমাতুল্লাহ। লোকেরা হযরত ঈসা (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হবে। তিনিও বলবেন, আমার সে অবস্থা নেই যে, তোমাদের জন্য কিছু একটা করবো। তোমরা বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাও।

তাঁর আগে-পরের সমস্ত কিছুকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকলে তখন আমার নিকট আসবে আর আমি তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইব। অনুমতি লাভের পর তথায় হাজির হবো এবং আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। আমি সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার মর্জি হবে ততক্ষণ আমি সিজদারত অবস্থায়ই থাকব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন- হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মাথা উত্তোলন করুন, যা কিছু বক্তব্য আছে পেশ করুন। আপনার কথা শ্রবণ করা হবে। যা কিছু চাওয়ার আছে প্রার্থনা করুন মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর আমি সিজদা থেকে মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের হামদ পেশ করবো যে ভাবে তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নির্দিষ্ট সীমার মাঝে থেকে শাফা'আত করবো।

উল্লেখিত এ শাফা'আতের যোগ্যতার জন্য আয়াতে বর্ণিত ইবাদত করতে হবে। অতিরিক্ত ইবাদতটি হল মাকামে মাহমুদ লাভের মাধ্যম যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন, এটি আপনার একটি অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' প্রতিষ্ঠিত করবেন। আয়াতের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবকে 'মাকামে মাহমুদ' দান করবেন । যদিও আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোন ইবাদতের বিনিময়ে প্রতিদান দান করেন না, সম্পূর্ণ তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমেই দিয়ে থাকেন। তথাপি বান্দার আগ্রহের জন্য এ ঘোষণা দেয়াটাও তাঁর পক্ষ হতে এক বিরাট অনুগ্রহ।

পিতা-পুত্রের জন্য যে অনুগ্রহ করার তা করবেনই, হাট থেকে যে খাবার সন্তানের জন্য নিয়ে এসেছেন তাকে তা দিবেনই। তথাপি বলে থাকেন যে, একবার আব্বু বল! তবে তা প্রদান করব। ঠিক অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার জন্য যা করবেন সম্পূর্ণই তাঁর অনুগ্রহে করবেন। তথাপি কখনো ঘোষনা দিয়েছেন যে, বান্দা তুমি এটা করো, আমি তোমাকে এটা দিব। এ ঘোষণা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশাল অনুগ্রহ।

যে তাহাজ্জুদের বরকতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাকামে মাহমুদ দান করবেন সে তাহাজ্জুদ উম্মত পড়ার দ্বারা কতই না পুরস্কার দান করাবেন। নিয়মিত পড়ার দ্বারা উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মাকামে বিলা'আত দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

তরজমা.

শয়ন-শয্যা থেকে তাদের দেহের পার্শ্ব পৃথক থাকে, তারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে তাদের আশায় ও আশংকায়, আর আমি যে রিযিক তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করে।

-সূরা সিজদা-১৬

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে সে সকল লোকেরা কোথায়? যারা সারা রাত আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকত, তাদের দেহ বিছানা স্পর্শ করতো না, তাদের সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে- تتجافى جنوبهم عن المضاجع অর্থাৎ যাদের দেহের পার্শ্ব বিছানা থেকে দূরে থাকত। এ ঘোষণার পর কিছু সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অতি সামান্য। অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে সে সব লোক কোথায়, যাদের ব্যবসা-বণিজ্য বা দুনিয়ার জিন্দেগীর ব্যস্ততা তাদেরকে আল্লাহর বন্দেগী থেকে গাফেল করতো না। رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله অর্থাৎ সে সব লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে গাফেল করে না।

-সূরায়ে নূর-৩৭

এ ঘোষণার পরও কিছু সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হবে, যাদের সংখ্যা হবে একেবারেই সামান্য। তারপর পুনরায় ঘোষক ঘোষণা দিবে, ঐসকল লোকেরা কোথায়, যারা সুখে-দুঃখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতো। এবারও সামান্য সংখ্যক লোক দাঁড়াবে, তখন তাদের সকলকে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

তাহাজ্জুদ কল্যাণের পথ

হযরত মা'আজ (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন একটি আমল বলেন, যার

দ্বারা আমি জান্নাত লাভ করতে পারব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞেস করেছ। আল্লাহ তা'আলা যাকে তৌফিক দান করেন তার জন্য তা কঠিন নয়। তুমি এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, কাবাগৃহে হজ্জ করবে। অতঃপর ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদের কল্যাণের কথা বলব না? শোন রোযা হল ঢাল, গুনাহ থেকে বাঁচা ও দোযখ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল, দান খয়রাত গুনাহকে এভাবে শেষ করে যেভাবে পানি অগ্নিকে আর মধ্য রাতে নামায আদায় করাও কল্যাণের পথ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, হে মা'আজ! আমি কি তোমাকে দীনের মাথা, খুঁটি ও উঁচু চূড়ার কথা বলবো না? হযরত মা'আজ (রা.) আরয, করলেন হ্যাঁ! অবশ্যই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দীনের মাথা হল ইসলাম, এর খুঁটি হল নামায আর উচ্চ চূড়া হল জিহাদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছুর ভিত্তি কি তা বলে দেব না?

আমি আরয করলাম, জ্বী হ্যাঁ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রসনা স্পর্শ করে ইরশাদ করলেন, একে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা।

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা রসনা দ্বারা কথা বললেও কি তার উপর ধরপাকড় হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে মা'আজ! তোমার মা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক, যাদেরকে অধোমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তা রসনার ব্যবহারের কারণেই করা হবে।

-তিরমিযী ও ইবনে মাজা শরীফ

তাহাজ্জুদ একটি কঠিন ইবাদত

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ✿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً

তরজমা.

'নিশ্চয়ই রাতের উত্থান খুবই কঠিন, আত্মসংযম এবং বাক্য সংশোধন হবার পক্ষে তা অতি উত্তম। 'হে রাসূল!' নিশ্চয়ই দিনের বেলাও রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।' -সূরা মুযযাম্মেল-৬,৭

রাতের আরাম পরিত্যাগ করে নামাযের জন্যে ওঠা এবং প্রস্তুত হয়ে দরবারে ইলাহীতে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ কাজ নয়। যে নফস বা প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়, নিঃসন্দেহে এটি তার জন্য অত্যন্ত কঠিন। এ কঠিন কাজটিকেই আলোচ্য আয়াতে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়েছে।

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, রাতের কিছু অংশ বিশ্রাম করে নামাযের জন্যে উঠাই হলো نَاشِئَةَ الَّيْلِ

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য শেষ রাতে উঠাকেই نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, রাতের প্রথম অংশে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়ানোকে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, এ পর্যায়ে একথা স্মরণযোগ্য যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ প্রহরে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ইশার নামাযের পর প্রত্যেক নামাযকেই نَاشِئَةَ বলা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-কে نَاشِئَةَ শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা উভয়ে বলেন, সমস্ত রাত ইবাদত করাই হলো نَاشِئَةَ الَّيْلِ

আয়াতের মর্মকথা হলো রাত্র-নিশীতে আরামের নিদ্রা হারাম করে নামাযের জন্য উঠা এবং সকল প্রকার প্রস্তুতি সেরে আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। নফস বা প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়, নিঃসন্দেহে এটি তার জন্য অত্যন্ত কঠিন। এ কঠিন কাজটিকেই আয়াতে ناشئة اليل বলা হয়েছে। বান্দার যে নফস আরামপ্রিয়, তাকে এর জন্য প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নয়, তবে রাত্রি জাগরণের এ পন্থা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর মাধ্যম। বিশেষত রাতের শেষ প্রহরে যখন পৃথিবীর মানুষ থাকে ঘুমন্ত, সমগ্র বিশ্ব থাকে নীরব, নিস্তব্ধ, আকাশ থাকে আলোকময়, চন্দ্র ও তারকারাজির আলোকে এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে– এমন সময় মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নৈপুর্ন্যের দিকে দেখে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করার এ অপূর্ব সুযোগ আসে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হয়, সে সময়টি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যে ধন্য হবার এক অপূর্ব সুযোগ। ইবাদত যত কঠিন তার ফযিলত তত বেশী এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সুযোগও বেশী। এ কারণে মরমী কবি বলেন–

غزالی ہو کہ رومی سعدی ہو کہ شیرازی

کچھ ہاتھ نہیں اتا بغیر اہ سحر گاہی

'গাযালী হোক বা রুমী, সাদী হোক বা সিরাজী, শেষ রাতের কান্নাকাটি ব্যতীত কারো হাতেই কিছু আসে না।'

রাতের শেষ প্রহরে যেহেতু মনের একাগ্রতা থাকে অপেক্ষাকৃত বেশী, মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠ থেকে আসে দু'আ, এজন্যে ঐ বিশেষ সময়ে দু'আ কবুল হয়। যেহেতু সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করে, মানুষ থাকে নিদ্রায় বিভোর, তাই লোক দেখানোর সম্ভাবনাও তখন থাকে না। আল্লাহ তা'আলার স্মরণে তন্ময় থাকার অনুকূল পরিবেশ তখনই সৃষ্টি হয়।

রাতের ইবাদত অতি উত্তম

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَـٰجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الأٰخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأَلْبَـٰبِ

তরজমা.

জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল হয়ে সিজদারত হয়, দণ্ডায়মান থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমতের আশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? যারা বুদ্ধিমান, শুধু তারাই ভেবে দেখে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। -সূরা যুমার-৯

আলোচ্য আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার ভক্ত-প্রেমিক বান্দা, তারা রাতের সুখময় নিদ্রা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দণ্ডায়মান হয়, সিজদারত হয় এবং একদিকে আল্লাহকে ভয় করে, অন্যদিকে তাঁর রহমতের আশাও করে। তারা কি সে সব লোকের সমান হতে পারে, যারা এমন নেক আমল করে না? যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে না, তাঁর বিধি-নিষেধ মানে না, কখনো আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে হাজির হয় না, আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তারা কখনো নেক্কারদের সমান হতে পারে না।

আয়াতের শানে নুযূল

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

১. যহাক (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতটি যাঁর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)।

২. তাফসীরকার কালবী (রহ.) হযরত আবু সালেহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) সম্পর্কে।

৩. অন্য একটি সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) এবং হযরত সালেম মওলা আবু হোজায়ফা (রা.) সম্পর্কে।

৪. ইকরামা (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে এবং হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে।

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে। ইবনে আবি হাতেমও এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৭. কালবী (রহ.)-এর আরো একটি মতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আম্মার (রা.) এবং হযরত সালমান (রা.) সম্পর্কে।

-তাফসীরে নূরুল কুরআন-২৩/৩০৩

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) লিখেছেন, এ সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করার ফলশ্রুতি হলো, যাঁদের নাম এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াত তাঁদের সকলের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, তথা আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য উপরোল্লিখিত সাহাবায়ে কিরামের সম্পর্কে প্রযোজ্য।

আল্লামা সুয়ূতি (রহ.) লিখেছেন, ইবনে মুনজের, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মরদবিয়া আবু নায়ীম এবং ইবনে আসাকের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, আয়াতে উল্লেখিত গুণাবলী ছিল হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর মধ্যে। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতি (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.)-এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন, আলোচ্য আয়াতটিতে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা রাত অতিবাহিত করেন নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে এবং সিজদারত অবস্থায়। আর قانت শব্দটির অর্থ হলো 'অনুগত'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের اناء اليل (রাতের বেলা) কথাটির তাৎপর্য হলো অর্ধেক রাত।

আল্লামা মানসুর (রহ.) বলেন, এর তাৎপর্য হলো মাগরিব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়।

আল্লামা কাতাদা (রহ.) বলেন, রাতের প্রথমাংশ, মধ্যভাগ এবং রাতের শেষ প্রহর।

আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের বৈশিষ্ট্য হলো তিনটি।

১. তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে।

২. তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশায় আশান্বিত থাকে।

৩. জীবনে ভয়ের প্রভাব অধিকতর থাকে, কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁদের অন্তরে ভয় থেকে রহমতের আশা অধিকতর থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সাহাবীর ইন্তেকালের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী অবস্থা? তিনি আরয করলেন, 'ভয় এবং আশার মাঝে রয়েছি।' তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তির অন্তরে এমন সময় এ দু'টি জিনিস একত্রিত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার আশা পূর্ণ করেন এবং তাঁকে তার ভয় থেকে নাজাত দান করেন।

নাসাঈ শরীফে একটি হাদীসে বর্ণিত, যে ব্যক্তি এক রাতে একশত আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাতের ইবাদত লিপিবদ্ধ হয়।

ইমাম রাজী (রহ.) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দিনের ইবাদতের চেয়ে রাতের ইবাদত উত্তম। কেননা এ আয়াতের اناء اليل (রাতের বেলার) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. রাত্রিকালে যখন সারা বিশ্বের মানুষ ঘুমন্ত থাকে, তখন কেউ এ ইবাদত দেখতে পায় না। ফলে রাতের ইবাদত 'রিয়া' বা লোক দেখানোর ভয় থেকে মুক্ত থাকে।

২. নিঝুম রাতে কোন কিছু দেখাও যায় না, কোন কিছু শ্রুতও হয় না। এমন অবস্থায় মন সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন বাধা-বিপত্তি থাকে না।

৩. রাত মূলত নিদ্রার এবং বিশ্রামের সময়। আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতে, তাঁর বন্দেগীর লক্ষ্যে নিদ্রা তথা বিশ্রাম পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর এজন্য এর সওয়াব অধিকতর। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদারত হওয়া এবং তাঁর সমীপে দণ্ডায়মান থাকা তাঁর নৈকট্য-ধন্য হবারই প্রমাণ। তাই রাতের ইবাদত উত্তম।

-তাফসীরে কাবীর-১৬/২৫০

রাতের বিভিন্ন প্রহরে তাহাজ্জুদ

وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى

তরজমা.

রাতের বিভিন্ন প্রহরে এবং দিবসের প্রান্তে তাসবীহ পাঠ কর (নামায পড়) যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। -সূরা ত্বহা-১৩০

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) এ আয়াতের তাফসিরে লিখেন, سبح শব্দটির সাথে بحمد ربك যুক্ত হওয়ার কারণে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থ হল নামায আদায় কর তোমার প্রতিপালকের হামদের সাথে। অর্থাৎ নামায আদায় কর সূরা ফাতিহার সাথে।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদের আহমদ শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায নেই। وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার

নামায। لَيْل অর্থ রাত। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির অর্থ হবে রাতের প্রথম অংশ। আবার কোন তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ এর দ্বারা যোহরের নামায উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, এটি দিনের প্রথমার্ধের শেষ প্রান্ত।

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ হে রাসূল! যদি উপরোল্লিখিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করেন তবে আপনি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সন্তুষ্ট হবেন।

-তাফসীরে নূরুল কুরআন-১৬/৩৪৩

মুফাসসিরগণ আরো লিখেছেন যে, দিবসের প্রান্তে যে নামায পড়া হয় তা যোহরের নামায। কারণ, যোহরের ওয়াক্তই দিবসের প্রথমার্ধের শেষ আর শেষাংশের শুরু। আর রাতের বিভিন্ন প্রহরে যে নামায পড়া হয়, তা হলো মাগরিব ও ইশা। কোন কোন মুফাসসির তাহাজ্জুদ নামাযকেও এর মধ্যে শামিল করেছেন। -ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ-১১

রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়া

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً

তরজমা.

রাতের কিয়দাংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। -সূরা দাহার-২৬

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত وَمِنَ الَّيْلِ দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের তাগিদ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাতের একটি বড় অংশ তথা অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম-বেশী আল্লাহ তা'আলার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ 'তাহাজ্জুদের' কর্মসূচীর বাস্তবায়নে মানুষ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে এবং এ অধ্যাত্মিক সাধনায় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য-ধন্য হওয়ার সুযোগ আসে। আউলিয়ায়ে কিরাম এমনিভাবে সাধনা

করেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রিয় ও পছন্দনীয় হন।

-তাফসীরে নূরুল কুরআন-২৯/৩৬৫

فَاسْجُدْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামায আদায় করা। তা মাগরিবের নামাযও হতে পারে বা ইশার নামাযও হতে পারে। কারো কারো মতে فَاسْجُدْ দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী সাহেব (রহ.) বলেন, যদি فَاسْجُدْ দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাসবীহ দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদ ছাড়াও বেশী বেশী তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এর মধ্যে মশগুল থাকবে।

আর যদি فَاسْجُدْ মাগরিব ও ইশার নামায উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাসবীহ দ্বারা এখানে তাহাজ্জুদ নামাযের অর্থ নেয়া হবে।

-ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ-১৫

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক জানেন, আপনি এবং আপনার সঙ্গী কিছু লোক রাতের দু'তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত অথবা এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকেন। -সূরা মুয্যাম্মেল-২০

এ আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায যা পূর্বে ফরয ছিল, তা রহিত হলো এবং অর্ধ রাত বা রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকার যে আদেশ ছিল তা সহজ করা হলো। এখন যে পরিমাণ তৌফিক হবে এবং সহজে সম্ভব হবে, সে পরিমাণই কুরআনে কারীম পাঠ করবে, নামায আদায় করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, মুয্যাম্মেলের প্রারম্ভে রাতের নামায তথা তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে যে নির্দেশ রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে তাহাজ্জুদের

নামায সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ঘোষণা করার পর তাহাজ্জুদের নামায নফলে পরিণত হলো।

এ বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যেও কি তাহাজ্জুদের নামায নফলে পরিণত হলো? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাহাজ্জুদের ফরয হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারেও রহিত হয়েছে।

কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, উম্মতের প্রতি তাহাজ্জুদের নামায ফরয রয়নি; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা ফরয ছিল।

রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ ও ক্ষমা প্রার্থনা

كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ✡ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

তরজমা.

আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের কারণে সামান্য অংশই তারা নিদ্রায় অতিবাহিত করতো।

রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

এ স্থানে দু'টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে যার প্রথমটিতে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করতো, অর্থাৎ তারা যে শুধু সৎকাজ করতো তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে তাঁরা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অধিক সময় ইবাদত– বন্দেগীতে মশগুল থাকতো।

আল্লাহ তা'আলার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা রাতের সুখ-নিদ্রা বর্জন করতো, রাতের অধিকাংশ সময়ই তারা নফল ইবাদতে অতিবাহিত করতো, আর খুব সামান্য সময়ই তারা বিশ্রাম

করতো। যেমন সূরায়ে ফুরকানে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً

যারা আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা ও দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাযে রাত অতিবাহিত করে। -সূরা ফুরকান-৬৪

করুণাময় আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা রাত অতিবাহিত করে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সিজদারত অবস্থায় অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায়।

উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আর রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ রাতের অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকার পরও রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কেননা তারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত থাকতো। এ মর্মে যদি ইবাদতে কোন ত্রুটি থেকে যায়, যদি কোন কারণে দরবারে ইলাহীতে আমার ইবাদত কবুল না হয়, সারারাত ইবাদত করেও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের হক তো আদায় হলো না, তাই আল্লাহ তা'আলার ওলীগণ রাতের শেষ প্রহরে এ মুনাজাত করেন, হে আল্লাহ! তোমার বন্দেগীর হক আদায় করতে পারলাম না, এজন্যে আমাকে মাফ করে দিও। হে আল্লাহ! আমি তাওবা করি, আমার তাওবা গ্রহণ কর, আমার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ রাতের কম অংশই বিশ্রাম করেন, অধিকাংশ সময়ই বন্দেগীতে মশগুল থাকেন এবং রাতের শেষ প্রহরে দরবারে ইলাহীতে ইস্তেগফার করতে থাকেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রাতের এক তৃতীয়াংশ যখন বাকী থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান থেকে ঘোষণা করেন, আমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মালিক। আছে কি কেউ যে আমার নিকট দু'আ করবে, তা হলে আমি তার দু'আ কবুল করবো। আছে কি

কেউ যে কিছু চায়? আমি তাকে দান করবো। যে আমার নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবে, আমি তার গুনাহ মাফ করে দিব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, ইস্তেগফার করতেন, এরপর বলতেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে, আসমান এবং জমিনের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তোমারই, তোমারই জন্যে সকল প্রশংসা সর্বত্র, তুমিই সত্য, সত্য তোমার প্রতিশ্রুতি। তুমিই চিরন্তন, একথাই সত্য। তোমার মহান বাণী সত্য, দোযখ সত্য, নবী রাসূলগণ সত্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য, কিয়ামত সত্য।

হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার প্রতি ঈমান রাখি, তোমার প্রতিই আমি ভরসা রাখি, তোমারই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার সাহায্যেই আমি দুশমনের মোকাবিলা করি। আমার বিষয় ফায়সালা করার জন্য আমি তোমারই নিকট হাজির হই, তুমিই আমাদের প্রতিপালক। তোমারই নিকট ফিরে আসতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য আমার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান, সব মাফ করে দিও। সর্বপ্রথম তুমি, আর সর্বশেষও তুমি। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তুমি ব্যতীত কেউ ইবদতের যোগ্য নেই।

-তাফসীরে নূরুল কুরআন-১৫/৩৭৫

হাদীসে নববীতে তাহাজ্জুদ

যাঁর মহান দরবারে সাদা-কালোর কোনও ভেদাভেদ নেই; যাঁর আচরণ ও বক্তব্যে কৃষ্ণাঙ্গ হযরত বিলাল (রা.) এবং শ্বেতাঙ্গ হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদার কোন পার্থক্য নেই; সাম্য-মৈত্রী-মমত্ববোধ এবং বিশ্ব-বোধ যে দরবারের বৈশিষ্ট্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ বংশ এবং ভাষা-নির্বিশেষে সকলে সমমর্যাদা লাভ করে যাঁর মাহফিলে, যাঁর আদর্শ পূর্ণ পরিণত, সর্বযুগোপযোগী, সার্বজনীন, চিরন্তন, মহান; যিনি মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ অর্জনের নির্ভুল নকশা নিয়ে আগমন করেছেন। যিনি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, যাঁর অনুসরণেই

রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী– তাঁর দরবারে মর্যাদার পার্থক্য শুধু ইবাদতের মাধ্যমে অর্থাৎ যার অবদান আমলের ক্ষেত্রে অধিক তার মর্যাদা সে দরবারে অধিক। আমলসমূহের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, রাতের আঁধারে, নির্জনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় মস্তক অবনত করা, তথা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযকে অধিক গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত ফযিলতসমূহের মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

বেহেশতের স্বচ্ছ অট্টালিকা

عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان فى الجنة غرفايرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها فقال اعرابى لمن هى يارسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام

'হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, জান্নাতে এমন কিছু অট্টালিকা রয়েছে যার বাইরে থেকে ভিতরের এবং ভিতর থেকে বাইরের সমস্ত কিছু দেখাযাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ সকল অট্টালিকা কাদের জন্য হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ সকল অট্টালিকা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে যারা অন্যদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাত্রিবেলা যখন পৃথিবীবাসী ঘুমের ঘরে ঢুলে পরে তখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে।'

হাদীসে চারটি আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার বিনিময়ে জন্নাতের স্বচ্ছ অট্টালিকা লাভ হবে। আমল চারটি হল-

এক. বিনম্রভাষায় কথা বলা।

দুই. ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো।

তিন. সর্বদা রোযা রাখা।

চার. রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ পরা।

আল্লাহ তা'আলা যাকে পছন্দ করেন

عن ابى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة يحبهم الله وثلثة يبغضهم الله فاماالذين يحبهم الله فرجل اتى قوما فسالهم بالله و لم يسئالهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل باعيانهم فاعطاه سرالايعلم بعطيته الاالله والذى اعطاوساروااليلهم حتى اذاكان النوم احب اليهم ممايتملقنى ويتلواايانى ورجل كان فى سرية فلقى العدوفاقبل بصدره حتى يقتل اويفتح له والثلثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزانى والفقير المختال والغنى الظلوم

হযরত আবু যর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। ঐ তিন ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তা'আলা মুহাব্বত করেন–

১. যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে কোন আত্মীয়তার সূত্রে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নামে সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু তারা তাকে কিছুই দিল না। তা দেখে তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তি পৃথক হয়ে গোপনে এমনভাবে তাকে কিছু দান করল যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানতে পারেনি।

২. যে ব্যক্তি সফর ইত্যাদির জন্য কোন কাফেলার সাথে নিশি ভ্রমণে বের হলো। এক সময়ে যখন সাথীরা গভীর নিদ্রায় বিভোর হলো, তখন সে জাগ্রত থেকে দাঁড়িয়ে আমার সম্মুখে বিনয়বনত বদনে প্রার্থনা করতে শুরু করে আমার কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হয়।

৩. যে ব্যক্তি কোন সৈন্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে সাথীরা পরাস্ত হয়ে যায়। কিন্তু সে একাকী বুক পেতে শত্রুর

মোকাবিলায় এগিয়ে যায়। পরিণামে সে শাহাদাত বরণ করল বা বিজয় লাভ করল।

আর যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন তারা হল–

১. ব্যভিচারী বৃদ্ধা। ২. অহংকারী ফকীর। ৩. সম্পদশালী জালিম।

-মিশকাত শরীফ

ফায়দা.

এই ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এদের একজনের কথা আবার কোন কোন বর্ণনায় একাধিক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এক হাদীসে এসেছে তিন ব্যক্তির দু'আ অবশ্যই কবুল করা হয়।

১. যে ব্যক্তি জনমানবশূন্য কোন গভীর বনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে; যাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখতে পায় না।

২. যে কোন বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এক পর্যায়ে সাথীরা ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে যায় কিন্তু সে একাই সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

৩. যে ব্যক্তি শেষ রাতে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে।

-জামে সগীর

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে খুশী মনে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। তাদেরকে দেয়া হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. ব্যভিচারী বৃদ্ধা। ২. মিথ্যাবাদী বাদশাহ। ৩. অহংকারী ভিক্ষুক।

-জামে সগীর

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাদেরকে ভালোবাসেন।

১. যে ব্যক্তি কোন সৈন্য দলের সংগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল আর একাই শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হয় শাহাদাত বরণ করল বা

বিজয় ছিনিয়ে আনল। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, দেখ! আমার এই বান্দা আমারই জন্য কত ধৈর্য আর সাহসিকতার সাথে কাজ করল।

২. যে ব্যক্তির রূপসী স্ত্রী আর আরামদায়ক কোমল বিছানা থাকা সত্ত্বেও কাম-লালসা ত্যাগ করে রাতে উঠে আমাকে স্মরণ করে। অথচ সে ইচ্ছা করলে আরামের সাথে শুয়ে থাকতে পারত।

৩. যে ব্যক্তি কোন কাফেলার সাথে সফর করছিল। পথ চলতে চলতে সকলেই কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করতে লাগল আর সে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হলো।

আল্লামা বাগভী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা দু'ব্যক্তিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন।

১. যে নরম, গরম বিছানা ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছেড়ে রাতে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বলেন, আমার বান্দাকে দেখ সে আরামের বিছানা থেকে বের হয়ে এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছেড়ে আমার সওয়াবের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে আমার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হয়েছে।

২. যে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে, এরপর পরাজিত হয়ে সাথীদের সাথে পালায়ন করে, এ অবস্থায় চিন্তা করে– জিহাদ থেকে পলায়ন তো অত্যন্ত বড় অপরাধ আর রণাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করে জিহাদে শরীক হওয়া অত্যন্ত বড় নেক আমল। একথা চিন্তা করার সাথে সাথে সে ফিরে আসে এবং জিহাদে শরীক হয়। এরপর সে শহীদ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, দেখ আমার বান্দা কিভাবে সওয়াবের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে জিহাদে ফিরে এসেছে, এমনকি তার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার আহ্বান

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترل ربناتبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنياحين يبقى ثلث الليل الاخريقول من يدعونى فاستجيب له من يسأ لنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفرله متفق عليه وفى رواية لمسلم ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم وظلوم حتى ينفجرالفجر

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে এসে ডেকে ডেকে বলেন, কে আছে আমার নিকট দু'আ করার? আমি তার দু'আ কবুল করব। কে আছে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার? আমি তাকে ক্ষমা করব।

মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়েতে আছে, তারপর আল্লাহ তা'আলা হাত প্রসারিত করে বলেন, কে আছে যে এমন প্রার্থীকে করজ দিবে যিনি দরিদ্র নন এবং অত্যাচারীও নন। প্রভাত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ধরণের ঘোষনা হতে থাকে। -মিশকাত শরীফ

বড়দের পক্ষ হতে ছোটদেরকে আহ্বান করা তা ছোটর জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। যদি কোন বাদশাহ সাধারণ নাগরিককে গ্রাম থেকে আহ্বান করে তবে তার খুশির অন্ত থাকে না। পাড়া-প্রতিবেশীও আশ্চর্যবোধ করতে থাকে। আর যদি তার যাওয়ার পর বাদশাহ নিজ আসন থেকে উঠে আসে বা তাকে ডাকার জন্য বাদশাহ তার গ্রাম্য ব্যক্তির বাড়িতে বা বাড়ির নিকটে চলে আসে তাহলে তো সে পাখাহীন আকাশে উড়তে থাকে, আশ-পাশের লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এমন কোন আহমকও দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যায় না যে, বাদশাহ তার জন্য নিকটে এসে তাকে আহ্বান করছে আর সে গাফেলের মতো অন্যমনস্ক হয়ে আছে বা ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আফসোস! সকল বাদশাহর বাদশাহ, পরাক্রমশালী আহকামুল হাকিমীন রাতের শেষাংশে এসে আমাদেরকে আহ্বান করতে থাকেন আর আমরা গাফলতের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকি।

আরশে বসে নয় বরং আমাদের সবচেয়ে নিকটের আকাশে এসে আমাদের ডাকতে থাকেন– আছে কি তোমাদের কোন চাওয়ার মতো, চাও আমার কাছে। আমি তোমাদের তা প্রদান করবো।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলেম এটাকে আয়াতে মুতাশাবেহাত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং তাদের মতে এর সঠিক অর্থ নিশ্চিতভাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। আমরা এর সঠিক মর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত।

হযরত ইমাম মালেক ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী এর দুটি অর্থ বর্ণনা করেছেন–

১. আল্লাহ তা'আলার অবতরণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁর রহমতের অবতরণ। অর্থাৎ ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়।

২. এর দ্বারা রহমতের ফিরিশতা উদ্দেশ্য। তাই অর্থ হবে, ঐ সময় রহমতের ফিরিশতা অবতরণ করেন।

আলোচ্য হাদীসের মধ্যে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়েতে এসেছে অর্ধরাত কিংবা রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর ঘোষণা আরম্ভ হয়। ফলে উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হিব্বান (রহ.) এ বিরোধের জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, বিভিন্ন রাতের হিসাবে এ সময় বলা হয়েছে। কোন কোন রাতে অর্ধরাত পরে, কোন কোন রাতে দু' তৃতীয়াংশ পরে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে শেষ রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় জবাব হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) দিয়েছেন, তিনি বলেন, হতে পারে রাতে তিন বার ডাক দেয়া হতো। সুতরাং রেওয়ায়েতের মাঝে কোন অমিল নেই।

আল্লাহ তা'আলাকে করজ দেয়ার অর্থ হলো দৈহিক অথবা আর্থিক ইবাদত করে আল্লাহ তা'আলা থেকে নিজের প্রতিদান নিয়ে নিবে। অর্থাৎ

দুনিয়াতে ভাল কাজ করে পরকালে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে।

হাদীসের মাঝে আল্লাহ তা'আলা নিজ থেকে দু'টি গুণ তথা দরিদ্র ও জুলুম রহিত ঘোষণা করে মানুষের নিকট করজ চাওয়ার রহস্য হলো, সাধারণত, মানুষকে করজ প্রদানে দু'টি জিনিস প্রতিবন্ধক হয়।

১. ঋণগ্রহিতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকা।

২. ঋণপরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মোটেও পরিশোধ না করা, কিংবা আলস্য ও কমতি করে পরিশোধ করা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ দুটি কমতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তিনি সৎকর্মের প্রতিদান কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা ছাড়া উত্তমভাবে দিয়ে দিবেন। উপরন্ত মূল সওয়াব থেকে আরও বহু গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। -মিরকাত

রাতের বিশেষ সময়

عن جابر رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان فى الليل لساعة لايوافقهارجل مسلم يسال الله فيه خيرامن امرالدنيا والاخرة الااعطاه اياه وذلك كل ليلة

'হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রাত্রিকালে এমন একটি সময় আছে, যদি ঠিক সে সময় কোন মুসলমান দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে কোন কিছু আরযী করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন।' -মিশকাত শরীফ

দুনিয়ার কোন প্রতাপশালী-বিত্তবান ব্যক্তি যদি রিলিফ প্রদানের ঘোষণা প্রদান করে তবে প্রত্যাশীরা তা পাওয়ার জন্য কি না করে থাকে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সামান্য সাহায্যের জন্য। যদি কোন বিত্তবান ঘোষণা করে, যে আজ রাতে যা প্রত্যেহ রাত জেগে আমাকে পাহারা দিবে, আমি তার সকল চাহিদা পুরা করবো। তবে কত লোকই না তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু কি হলো অসহায়-সম্বলহীন, মুখাপেক্ষী দুর্বল বান্দাদের, যারা প্রতি মুহূর্ত দয়াময় আল্লাহ তা'আলার দয়ার মুহতাজ। তাঁর পক্ষ হতে দুনিয়া ও আখেরাতের

সকল চাহিদা পুরা করার ঘোষণা হচ্ছে, তার জন্য বান্দা সামান্যতমও কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। বান্দার চাওয়া ছাড়াই তো হাজারো অমূল্য সম্পদ ও সীমাহীন নিয়ামত প্রদান করেছেন। এখন বাকী চাহিদা পুরা হওয়ার জন্য শুধু চাওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন যে, বান্দা তুমি আমার নিকট চাও, আমি দিয়ে দিব। রাতে রয়েছে এমন সময় যাতে দু'আ কবুল করা হয়, অতএব আমাদের উচিত, আমরা দুনিয়া-আখেরাতের সকল চাহিদা পুরা করার লক্ষ্যে রাত্র নিশীতে তাহাজ্জুদের দ্বারা মহান রাব্বুল আলামীনের সমীপে চেয়ে নিব।

রাতের যে সময়কে দু'আ কবুলের জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে সে সময় মুসলমানের যে কোন ভাল দু'আ চাই তা দুনিয়ার ব্যাপারে হোক কিংবা আখেরাতের ব্যাপারে হোক আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন।

তবে সে সময়টি নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

এক দল মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট ঐ সময়টি অনির্দিষ্ট। রাতের যে কোন সময় হতে পারে। যেমনিভাবে কদরের রাত্রি ও জুম'আর দিনের দু'আ কবুল হওয়ার সময়টি অনির্দিষ্ট।

অনেক মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে আবার সময়টি নির্দিষ্ট এবং তারা অর্ধরাতের পরের সময়কে নির্ধারণ করেছেন।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেছেন, সে সময়ের সন্ধানে মানুষের খুব চেষ্টা করা উচিত। কেননা, এমন সময় সামান্য আমল দ্বারাও অনেক প্রতিদান লাভ করা যায়।

হযরত দাউদ (আ.)-এর নামায

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصلوة الى الله صلوة دواد واحب الصيام الى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطريوما

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে

পছন্দনীয় নামায হলো হযরত দাউদ (আ.)-এর নামায। আর সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা। হযরত দাউদ (আ.) অর্ধরাত পর্যন্ত নিদ্রিত থাকতেন, এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। এরপর রাতের ষষ্ঠ অংশে ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, আর একদিন রোযা রাখতেন না।'

-মিশকাত শরীফ

ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। এখানে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার দ্বারা সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ হয়। প্রেমিক প্রেমিকাকে মুহাব্বতের পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময় মাহবুবার যখন কষ্ট হতে থাকে তখন মাহবুব মনে মনে তৃপ্তি লাভ করে। এ তৃপ্তি মাহবুবা কষ্ট পাচ্ছে তার জন্য নয়; বরং মাহবুবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, সারা জীবন তাকে নিয়ে শঙ্কাহীন জীবন যাপন করা যাবে। ঠিক অনুরূপ আহকামুল হাকিমীন তাঁর বান্দার আমলের উপর আনন্দিত হন এজন্য নয় যে, বান্দার খুব কষ্ট হচ্ছে, বরং তিনি আনন্দিত হচ্ছেন এজন্য যে; বান্দা তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। এখন সে তার মঞ্জিলে পৌছে যাবে। হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলটি যদিও বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার কোন আমলই অনন্তকাল জাহান্নামের কষ্টের তুলনায় কিছুই নয়। তাই কোন বান্দা যদি হযরত দাউদ (আ.)-এর ন্যায় আমল করে অনন্ত-অসীম জান্নাত পেয়ে যায় তাতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত আনন্দিত হন।

এ জাতীয় ইবাদত অধিক পছন্দ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু রাতের দু' তৃতীয়াংশ নিদ্রা যাওয়ার পর স্বভাবের মধ্যে আনন্দ ও উদ্যম আসে এবং মন-মস্তিষ্ক উপস্থিত থাকে এবং ঐ সময়ে ইবাদত করার ফলে ইবাদত খুব সুন্দরভাবে আদায় হয়, এজন্য এভাবে নামায পড়াকে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায বলা হয়েছে। তদ্রূপ একদিন রোযা রেখে একদিন ইফতার করার মাঝে আত্মার উপর কষ্ট ও পরিশ্রম অধিক হয়। আর অধিক পরিশ্রমের ফলে প্রতিদানও বেড়ে যায়। এজন্যে এ ধরনের রোযা পছন্দ করেছেন।

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মায়ের উপদেশ

عن جابر قال قال رسول الله قالت ام سليمان بن داد سليمان يابنى لاتكثرالنوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرايوم القيمة

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একদিন হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.)-কে তাঁর মা বললেন, বৎস! রাতে বেশী ঘুমিও না। কারণ রাতে বেশী ঘুমালে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মানুষ দরিদ্র হয়ে যায়।

-ইবনে মাযা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সারা রাত খোদাবিমুখতা ও অলস নিদ্রায় অতিবাহিত করলে মানুষ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আজ আমাদের অর্থনৈতিক সংকটের এটাও একটি কারণ যে, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে সমস্ত রাত বিভোর নিদ্রায় কাটিয়ে দেই। সাধারণ লোক তো বহু দূর, অনেক আলেমও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের অধিক ঘুমকেই তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তাহাজ্জুদ মুমিনের ইজ্জত ও মর্যাদার কারণ

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتى حملة القرأن واصحاب الليل

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি হলো কুরআন সংরক্ষণকারী ও তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারী।' -বাইহাকী কিতাবু ঈমান

হামেলে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ হাফিযে কুরআন যারা সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তার হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমল করে। সাহেবুল লাইল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে সারা রাত্রি ইবাদত-বন্দিগীতে অতিবাহিত করে, তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদিতে

রাত্র অতিবাহিত করে। এই আমল এ কারণেই শ্রেষ্ঠ যে রাতের সমস্ত আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস পরিহার করে একমাত্র মহান রাব্বুল আলামিনের সামনে সিজদায় অবনত থাকা মুমিনের জন্য নফসের উপর অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর এ কাজকে যে বাস্তবায়ন করতে পারে সেই সর্বাধিক সম্মানিত।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن جابرر رضى الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم الله لاتدعن صلاة الليل ولوحلب شاة

'হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে যাবের! তুমি রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) কস্মিনকালেও ছেড় না। অবশ্যই তা আদায় করো, যদিও তা একটি বকরীর দুধ দোহন করার সমপরিমাণ হয়।' -জামেউল ফাওয়ায়েদ

উল্লেখিত হাদীসে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, সামান্য হলেও তাহাজ্জুদ আদায় করো। কোন অবস্থাতেই তা পরিহার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে এত গুরুত্ব প্রদানের কারণ বহু রয়েছে। তবে তার মাঝে এটাও একটি যে, উম্মতের সম্মান-মর্যাদা সমস্ত কিছুই এ তাহাজ্জুদের উপর নির্ভর। ইরশাদ হচ্ছে–

اعلم ان شرف المومن قيام الليل وعزه استغناه عن الناس

'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!' খুব ভাল করে জেনে নিন, মুমিনের বুযুর্গী ও মর্যাদা রাত্রি জেগে নামায পড়ার মাঝে এবং তাদের ইজ্জত ও সম্মান মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার মাঝে।'

-জামেউল ফাওয়ায়েদ

এ বিষয়ে হযরত সাহল (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাকুন তবে একসময় আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে সন্দেহ নেই। ভাল-মন্দ যা ইচ্ছা করতে থাকুন, অবশেষে একদিন প্রতিদান পাবেন। যার সাথে মনে

চায় বন্ধুত্ব করুন। একসময় বিরহ জ্বালা ভোগ করতেই হবে। মুহাম্মদ! আপনি ভালোভাবে জেনে রাখুন, রাতে উঠে নামায পড়ার মধ্যে মুমিনের বুযুর্গী আর অমুখাপেক্ষীতার মধ্যে তার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত।

নিরাপদে বেহেশতে যাবার পথ

عن عبدالله بن سلام قال لمادخل النبى صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قدم النبى صلى الله عليه وسلم فجئت فى الناس لانظرفلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب وكان اول شيئ سمعته تكلم به ان قال ايها الناس افشواالسلام واطعموا الطعام وصلواالارحام وصلوابالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন লোকেরা তাঁকে দেখার জন্যে দৌড়ে আসল। আমিও লোকদের সথে আসলাম তাঁর নবুওয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্যে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার প্রতি তাকিয়ে সাথে সাথে বললাম, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

সে স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত প্রথম যে বাণীটি শুনেছি তা ছিল, হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর সালাম আদান প্রদান কর। দরিদ্রদেরকে অন্ন দান কর। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং রাত্রিবেলা সকলে নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর নামায পড়। তাহলে নিরাপদে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

-কিয়ামুল লাইল

ফায়দা.

প্রত্যেক মুমিনের আন্তরিক প্রত্যাশাই হলো, দুনিয়া যেভাবেই চলে যাক পরপারে যেন নিরাপদে বেহেশতে প্রবেশ করা যায়। এ জন্য প্রত্যেক মুমিন বিভিন্ন ভাবে প্রচেষ্টা করে থাকে। আলোচ্য হাদীসে এমনই চারটি আমলের কথা বলা হয়েছে যেগুলোর উপর আমল করার দ্বারা মুমিন নিরাপদে বেহেশতে যেতে পারবে। আমল চারটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. অপরকে সালাম প্রদান করা

নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন বাড়িয়ে দেয়া। কেননা, এতে আপোসের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা যে পর্যন্ত পরস্পরে একে অপরকে ভাল না বাসবে সে পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলে দেব যা গ্রহণ করার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে? তোমরা একে অপরকে বেশী বেশী সালাম করবে। -মুসলিম শরীফ

২. আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা

আপন মাতা-পিতা, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ ও ভাল ব্যবহারের চেষ্টা করা সকলের কর্তব্য। কারণ এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু হাদীসে আলোচনা হয়েছে। একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমিই রহমান। আমিই দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছি এবং আমিই আমার 'রহমান' নাম থেকে 'রহীম' নাম বের করেছি। সুতরাং যে মানুষের সাথে দয়ার সম্পর্ক করবে আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়ে নেব। আর যে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করব। -তিরমিযী শরীফ

৩. দরিদ্র-অসহায়কে খানা খাওয়ানো

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এদেরকে খানা খাওয়ানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তার ভাইকে পেট ভরে খানা খাওয়াবে এবং তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি পান করাবে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তি এবং জাহান্নামের মাঝে সাত খন্দক পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। এক খন্দকের পরিমাণ হলো সাত শত বছরের পথ।

-কানজুল উম্মাল

৪. তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারী

এমন সময় নামায পড়া, যখন সমস্ত মানুষ আরামে ঘুমিয়ে থাকে। এর ফযীলত ও গুরুত্ব এবং সওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কেও বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞস করলাম, আমাকে এমন কিছু কাজ বলে দিন যার উপর আমল করার দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তিনটি জিনিস বললেন–

১. বেশী বেশী সালাম দিবে।

২. দরিদ্র-মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।

৩. রাত্রে নামায আদায় করবে অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে–

عن اسماء بنت يزيد عن رسول الله قال يحشرالناس فى صعيد واحد يوم القيامة فينادى مناد فيقول اين الذى كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون و هم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يومرلسائرالناس الى الحساب

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একটি মাঠে সমবেত করা হবে। তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন যে, যাদের পার্শ্ব বাহু রাতে বিছানা থেকে পৃথক থাকত অর্থাৎ যারা রাত জেগে নামায পড়ত তারা আজ কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সংখ্যায় হবে এরা খুবই নগণ্য।

-মিশকাত শরীফ

তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের কত বড় ফযীলত ও মর্যাদা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিনা হিসাবে এবং সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে এর তাওফীক দান করেন। আমীন।

তাহাজ্জুদ অন্ধকার কবরের নির্জনতা দূর করে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى ذرلواردت سفرا اعددت له عدة قال نعم قال فكيف سفر طريق القيامة الاانبئك ياباذرما ينفعك فى ذلك اليوم قال بلى بابى انت وامى قال صم يوما شديد الحرليوم النشوروصلى ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الامور وتصدق صدقة على مسكين اوكلمة حق تقولها او كلمة شر تسكت عنهاء احناء

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-কে একদিন বললেন, হে আবু যার! দুনিয়ায় সফর করতে হলে তুমি কি পাথেয় সংগ্রহ কর না? আবু যর (রা.) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে কিয়ামতের কঠিন সফরের জন্য তুমি কি সংগ্রহ করেছ? হে আবু যর! আমি কি তোমাকে এমন কিছু বলে দেব যা কিয়ামতের দিন তোমার উপকারে আসবে? আবু যার (রা.) বললেন, জ্বি হ্যাঁ বলুন। আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসের জন্য প্রচণ্ড গরমের দিনে রোযা রাখ, অন্ধকার কবরের নির্জনতা দূর করার জন্য রাতের অন্ধকারে উঠে দু'রাকাত নামায পড়, গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতা লাভের জন্য হজ্জ পালন কর, গরীব-মিসকীনকে দান-খয়রাত কর এবং হয়ত সত্য কথা বল নতুবা নিশ্চুপ থাকো।

-ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সফরের সাথে তুলনা কের বুঝিয়েছেন। দুনিয়ার উদাহরণ দ্বারা প্রতিটি জিনিস সহজেই বুঝে আসে যেমনটি বুঝিয়েছে এ হাদীস।

মানুষ যখন দুনিয়ার বুকে সফর করে, তখন পূর্ব থেকেই তার পাথেয় সংগ্রহ করে থাকে। সফর যে ধরনের হয় তার প্রস্তুতিও সে ধরনের হয়। কোন সুস্থজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এমন পাওয়া যাবে না যে, সে শূন্য হাতে সফর করে। অথবা জেনে বুঝে প্রয়োজনের চেয়ে কম পাথেয় নিয়ে সফর করে।

এ দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; কিয়ামতের দীর্ঘ ও কঠিনতম সফর প্রতিটি মানুষই যার সম্মুখীন হতে হবে তার জন্যও ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়া দরকার। যার ফলে এ দীর্ঘ সফরে মানুষের কোন পেরেশানী ভোগ করতে না হয়। এজন্য তিনি এমন চারটি কর্মপদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন যা আখেরাতের সফরে অধিক উপকারে আসবে। বিভিন্ন হাদীসে যার অপরিসীম গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে সে চারটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. প্রচণ্ড গরমের দিন রোযা রাখা

এটি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার দিন উপকারে আসবে এবং সেদিনের সকল পেরেশানী আর বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে। সূর্য যখন মানুষের একেবারেই নিকটে থাকবে; সেদিন রোযা মানুষের উপকার করবে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মানুষের উপকার এবং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মানুষকে রক্ষা করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, রোযা দুনিয়াতে গুনাহ থেকে এবং আখেরাতে দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ।

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রচণ্ড গরমের দিনে রোযা রাখবে; কিয়ামতের দিন তিনি তাকে তৃপ্ত করবেন। এজন্য হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) রোযা রাখার জন্য এমন দিনের সন্ধান করতে থাকতেন। -তারগীব ও তারহীব

২. রাতের অন্ধকারে নামায আদায় করা

হাদীসে বর্ণিত বাক্যটি দ্বারা তাহাজ্জুদকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এটা কবরের নির্জনতা ও অন্ধকার দূর করে। কবর মানব জাতির জন্য আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি। এ ঘাঁটিতে যারা মুক্তি পেয়ে গেল তারা বাকী সমস্ত ঘাঁটিতেই মুক্তি পাবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান হবে অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত হবে। রাতের

অন্ধকারে নিয়মিত তাহাজ্জুদ বান্দাকে এই ভয়াবহ ঘাঁটিতে নিরাপত্তা ও আলো দান করে– এর অর্থ হল তাকে জান্নাতবাসী করে দেয়।

৩. হজ্জ আদায় করা

এটা আখেরাতের সফরে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য খুবই উপকারে আসে। হজের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন হদীস বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হজ করল, হজ আদায়কালে স্ত্রী সহবাস ও তার আলোচনা এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকল; সে যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় পবিত্র ও নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসল। -বুখারী শরীফ

৪. দান-সদকা করা

দান-সদকাও আখেরাতে মানুষের জন্য উপকারী বস্তু। অসংখ্য হাদীসে এর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা সদকার কাজ দ্রুত সম্পাদন কর। কারণ, সদকা করলে বিপদ দূর হয়। -মিশকাত শরীফ

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সদকা দ্বারা তোমরা রোগের চিকিৎসা কর। কারণ সদকা অমর্যাদাকে দূর করে এবং নেক বৃদ্ধি করে। রোগ নিরাময় করে ও আয়ু বৃদ্ধি করে।

পঞ্চম উপদেশ হলো, ভালো কথা বলা আর মন্দ কথা না বলে চুপ থাকা। এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়। জিহ্বা মানুষের ছোট্ট একটি অঙ্গ। কিন্তু এর দ্বারা অনেক গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে।

হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন হয় ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

তাহাজ্জুদের জন্য পানি ছিটিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত করা

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلاقام من الليل فضلى وايقظ امراته فصلت فان ابت نصح وجهها الماء ورحم الله امراة قامت من الليل فضلت وايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت على وجهه الماء

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে স্বামী রাতে উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও উঠিয়ে দেয়, ফলে সেও নামায পড়ে আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, তার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়। আরও রহমত বর্ষিত হয় সে স্ত্রীর উপর যে নিজে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে আর উঠতে অস্বীকার করলে তার স্বামীর মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। -আবু দাউদ শরীফ

ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সহযোগী হলে তা অত্যন্ত মঙ্গলময় ও গতিশীল হয়। এর মধ্যে পরিতৃপ্তিও মিলে অধিক পরিমাণ। একে অপরকে আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, ঘুমের অবস্থায় জাগিয়ে দিলে, আমল বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করলে তা সত্যিই আনন্দদায়ক হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করার ক্ষেত্রে চেহারায় পানি ছিটানোর কথা এসেছে। এটা আত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তথ্যবহ ও হিকমতপূর্ণ। কোন কোন মুহাদ্দিসীনে কিরামগণের মতে পানি ছিটিয়ে দেয়া বলার দ্বারা যা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ ঘুম খুব ভারী হলে সামান্য পানি মুখের উপর ছিটিয়ে দিয়ে ঘুম থেকে জাগানো। দীনকে সামনে রাখলে এতে করে উভয়ের মাঝে মুহাব্বত আরো প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, পানি ছিটা দেয়ার অর্থ হলো, তাহাজ্জুদের জন্য উঠানোর চেষ্টা করা, বাস্তবে পানি ছিটানো উদ্দেশ্য নয়।

উল্লেখিত হাদীসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তম ব্যবহার ও পূর্ণ স্নেহ-মমতা বজায় রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছ। শুধু স্বামী একাই শাসনসূলভ আচরণ

করে স্ত্রীকে উঠাবে এমনটি বলা হয়নি। স্ত্রীও মুহাব্বতের সাথে উঠাতে পারবে। আর এ শিক্ষাটিও শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে, উস্তাদ-ছাত্রের মাঝে এ ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। প্রকৃত বন্ধুত্ব তো এটাই যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে ভালো ও কল্যাণকর কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৎ কাজে অন্যকে বাধ্য করা শুধু জায়েযই নয় বরং মুস্তাহাব।

তাহাজ্জুদকারীগণ যাকেরিনদের অন্তর্ভুক্ত

عن ابى شعيد وابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اليقظ الرجل اهله من الليل فصليا اوصلى ركعتين جميعاكتبامن الذاكرين والذاكرات

হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে এবং উভয়ে দু'রাকাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কুরআনে বর্ণিত যিকিরকারী পুরুষ এবং যিকিরকারী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

-আবু দাউদ শরীফ

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اهل শব্দ উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ শুধু স্ত্রীরই নয় বরং পরিবারে সকল সদস্য, সন্তান-নন্তুতি, আত্মীয়-স্বজন যে কেউ হতে পারে। অর্থাৎ যাকেরীনদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা তাদের নামকে অধিক যিকিরকারীদের তালিকাভুক্ত করে নেয়ার জন্য ফিরিশতাদের নির্দেশ দিবেন এবং কালামে পাকে বর্ণিত অধিক যিকিরকারীদের জন্য যে সওয়াবের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। রাতের আঁধারে গোটা দুনিয়া যখন আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে নীরব তখন তাদের সামান্য যিকিরই অন্য সময়ের অধিক যিকিরের পরিমাণ হয়।

তাহাজ্জুদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারকে গুরত্ব দেয়া

عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلافقال الاتصليان

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতে আমার ও ফাতেমার কাছে এসে আমাকে ঘুমন্ত দেখে বললেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড় না? -বুখারী ও মুসলিম শরীফ

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ধর্মীয় ব্যাপারে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি লক্ষ রাখা প্রতিটি মানুষের ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসংঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুন! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন যিম্মাদার। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে তাহাজ্জুদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় তাহাজ্জুদ নামাযের কতখানি গুরুত্ব তা স্পষ্ট বুঝা যায়। -ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ-৫৪

তাহাজ্জুদের জন্য দাউদ পরিবারকে উঠিয়ে দেয়া

عن عثمان بن ابى العاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداودعليه السلام ساعة يوقظ فيها اهله يقول يا ال داود قوموافصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله عزوجل فيها الدعاء الالساحراوعشار

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, হযরত দাউদ (আ.) রাতের বিশেষ একটি মুহূর্তে (শেষার্ধে) তার পরিবারবর্গকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন, হে দাউদ পরিবার! ঘুম থেকে উঠে নামায পড়। কারণ এ সময় আল্লাহ তা'আলা যাদুকর আর ছিনতাইকারী ব্যতীত সকল মুসলমানের দু'আ কবুল করে নেন। -মিশকাত শরীফ

হযরত দাউদ (আ.) তাঁর পরিবারবর্গকে তাহাজ্জুদের জন্য দু'টি কারণে জাগাতেন।

১. দাউদ পরিবারের জন্য তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ ছিল। তাই তিনি সময়মত পরিবারের সদস্যদের জাগিয়ে দিতেন।

২. কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়ে তারাও যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে আপন আপন উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করতে পারে।

আলোচ্য হাদীসে দুই শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে, যাদের দু'আ কবুল করা হবে না। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. যাদুকর ও ছিনতাইকারী আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতকে কষ্ট দেয়। তাই তাদের দু'আ কবুল হবে না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোন এক ব্যক্তি বলেন, দাসত্বের হাকীকত হলো দু'টি–

১. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

২. সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করা। যাদুকর আর ছিনতাইকারী এ দুই শ্রেণীর লোকদের মাঝে দাসত্বের কোন হাকীকতই নেই। তাই তাদের দু'আ কবুল হয় না।

২. আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, কঠোরতা প্রকাশের জন্য সমস্ত মুসলমান থেকে শুধু এই দুই শ্রেণীর মানুষের দু'আ কবুলিয়াত থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেন এরা আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রহমত থেকে একেবারেই বঞ্চিত। এই জঘন্য পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে এরা রহমতের ভাগ পাবে না। এও হতে পারে যে, মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত থাকার কারণে তাহাজ্জুদ নামাযের ন্যায় উত্তম আমলের তৌফিকই এদেরকে দেয়া হবে না। এভাবে এরা দু'আ কবুল হওয়ার ফযীলত থেকে বঞ্চিত। -মিরকাত

তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করা

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না। যে কিছুদিন রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে পরবর্তীতে তা ছেড়ে দেয়। -বুখারী ও মুসলিম

বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কিরাম আলোচ্য হাদীসটির দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস দ্বারা আমল ও মুজাহাদার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করার শিক্ষা দিয়েছেন। এ হিসেবে হাদীসের অর্থ হলো, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় হয়ো না, যে প্রথমে গোটা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তো আর কদিন পর ধৈর্য হারিয়ে তাহাজ্জুদ পড়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল। বিভিন্ন হাদীসে এ অভ্যাসকে নিন্দনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা ততটুকু কর যতটুকু নিয়মিতভাবে সব সময় করা সম্ভব হয়। এমন যেন না হয় যে, প্রথমে শক্তি অপেক্ষা বেশী করা শুরু করে দিলে কিন্তু কদিন পর অধৈর্য হয়ে তা বিলকুল ছেড়ে দিলে।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে যে, যে কাজ নিয়মিতভাবে পাবন্দীর সাথে করা হয়; আল্লাহ তা'আলার নিকট তা অধিক প্রিয়। যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

২. আলোচ্য হাদীসে নেক আমল শুরু করার পর তা ত্যাগ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় হয়ো না, যে রাতের কিছু সময় জেগে নামায পড়ে, আবার কদিন পর কোন ওযর ছাড়াই তা ছেড়ে দেয়। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে- تارك الوردملعون 'নফল ইবাদত শুরু করে বর্জনকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এই অভিশাপ থেকে আশ্রয় পার্থনা করেছেন। কাজেই প্রত্যেকের ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করার চেষ্টা করা দরকার। ইবাদত শুরু করে ছেড়ে দেয়া মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربته الى الله وتكفيرللسيئات ومنهاة عن الاثم ومطردة للحسنة

হযরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রাত্রি জাগরণ করবে। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎ ও পুণ্যবান লোকদের স্বভাব আর রাত্রি জাগরণ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও গুনাহের কাফফারা এবং গুনাহ থেকে বারণকারী ও হিংসা বিদূরিতকারী।

আলোচ্য হাদীসে তাহাজ্জুদের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। বলাবাহুল্য, একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে? কারণ দুনিয়ার বুকে সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো মহান আহকামূল হাকেমীনের সন্তুষ্টি অর্জন। পবিত্র কালামে পাকে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সামান্য সন্তুষ্টিই অনেক বড়।

২. গুনাহের কাফ্ফারা হওয়া

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে তথা রাত্র নিশিতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মানুষের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মস্ত বড় নিয়ামত। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, নফল ইবাদত দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। যেহেতু নফল আদায়ের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাওবা-ইস্তিগফারও করা হয়। তাই হাদীসের মধ্যে তাওবার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি।

৩. নাফরমানী থেকে হেফাজত রাখে

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর নাফরমানী ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখেন। এটাই নাফরমানী থেকে বাঁচার সর্বোত্তম ও সফলজনক মাধ্যম। তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি স্বভাবতই গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

৪. হিংসার মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হিংসার মত একটি ব্যাধি থেকে হিফাজত রাখেন এবং তাহাজ্জুদের বরকতে এই গুনাহ হয়ে গেলেও তাকে ক্ষমা করে থাকেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের নামায অপেক্ষা উত্তম

روى عن انس يرفعه قال صلوة فى مسجدى تعدل بعشرة الاف صلوة وصلوة فى مسجدالحرام تعدل بمائة الف صلوة والصلوة بارض الرباط تعدل بالفى الف صلوة واكثرمن ذالك كله الركعتان يصليهما العبدفى جوف الليل لايريدبهماالاماعندالله عزوجل

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার মসজিদে এক রাকা'আত নামায আদায় করা দশ হাজার রাকা'আত নামাযের সমান, মসজিদে হারামের এক রাকা'আত এক লখ রাকা'আতের সমান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের নামায বিশ লাখ নামাযের সমান। কিন্তু গভীর রাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে দু'রাকা'আত নামায পড়া হয়, তার মর্যাদা এর চেয়েও অনেক বেশী। -তারগীব ও তারহীব

আলোচ্য হাদীসে তাহাজ্জুদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদের সওয়াব সমজিদে নববী, মসজিদে হারাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে নামায পড়ার চেয়েও অনেক বেশী।

'রিবাত' ইসলামের শক্রর মোকাবিলায় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রহরার জন্য বসে থাকাকে বলা হয়। যাতে শক্ররা ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্ত

রে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। উল্লেখিত বর্ণনা ছাড়া আরো অনেক বর্ণনায়ও সীমান্ত প্রহরার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং এর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। ফাযায়েলে জিহাদ নামক কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পবিত্র কালামে পকে এ কাজের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তরজমা. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, বাতিলের মোকাবিলায় মজবুত থাক, 'বাতিলের মোকাবেলায় যুদ্ধের জন্য' সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। -সূরা আল ইমরান-২০০

তিন অবস্থায় দু'আ ব্যর্থ হয় না

ثلثة مواطن لاتودفيها دعوةعبد رجل يكون فى برية حيث لايراة الاالله فيقوم فيصلى ورجل يكون معه فئة فى الجهادفيفرعنه اصحابه فثبت ورجل يقوم أخرالليل

তিনটি ক্ষেত্র এমন যে, সেখানে মুমিনের কোন দু'আ ব্যর্থ হয় না।

এক.

জনমানব শূন্য কোন গভীর বনে দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তি নামায পড়ে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ তাকে দেখতে পায় না।

দুই.

কেউ কোন সৈন্য দলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর তার সাথীরা পালিয়ে যায় এবং সে দৃঢ়তার সাথে শক্রর মোকাবেলা করতে থাকে; এমন ক্ষেত্রে।

তিন.

যে ব্যক্তি রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করে।

আলোচ্য হাদীসে এমন তিনটি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কোন দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা প্রত্যাখ্যান করেন না।

প্রথম ক্ষেত্র.

গভীর বনে নামায পড়া, যেখানে দেখার মত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ নেই– এমতাবস্থায় দু'আ করলে ব্যর্থ হয় না। বলা বাহুল্য, এমন ক্ষেত্রে যে ইবাদত করা হয়, তাতে রিয়া বা অহংকার প্রদর্শনের কোন অবকাশ থাকে না। তখনকার নামায শুধু আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। তাই তখন দু'আ করলে তা কবুল হয়।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় আযান দিয়ে নামায আদায় করে; আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, দেখ, আমার এই বান্দা আমারই ভয়ে আযান ও নামায কায়েম করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম ও জান্নাতে স্থান দিলাম।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র.

এক ব্যক্তি জিহাদে যোগ দেয়। কিন্তু তার সাথীরা তাকে একাকী ফেলে পালিয়ে যায়। তবুও সে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকে। এই ব্যক্তির দু'আও আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাখ্যান করেন না। উল্লেখ্য যে, জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। তদুপরি একাকী শত্রুর মোকাবেলা করার কারণে এই ব্যক্তির এ জিহাদের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

তৃতীয় ক্ষেত্র.

রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করা; আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির দু'আও প্রত্যাখ্যান করেন না।

-ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ-৫৬

তাহাজ্জুদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের অমূল্য বাণী

সাহাবায়ে কিরাম ঐ আত্মত্যাগী জামা'আতের নাম যারা ইসলামের জন্য নিজের জীবন কুরবান দিতে সামান্য কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অঙ্গুলী হেলানোর সাথে সাথে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, সমুদ্রের গভীরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইসলামের জন্য স্ত্রী-

পরিবার, ধন-সম্পদ সমস্ত কিছু বর্জন করতে সামান্য চিন্তাও করতেন না। তাদের জান-মাল, পরিবার-পরিজনসহ সমস্ত কিছুর বিনিময়ে একমাত্র লক্ষ ছিল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন। এর জন্য দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে অথবা দিবা-রাত্রি বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কুরআন ও হাদীসে যেহেতু নফল ইবাদতের মধ্যে তাহাজ্জুদকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাই সাহাবায়ে কিরামও এই আমলকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। পরবর্তী উম্মতের আমলের জন্য অমূল্য উপদেশও রেখে গেছেন। সে অসংখ্য মূল্যবান উপদেশে মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বাণী

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولا ثلث لولا ان اسافر فى سبيل الله اواغفر جبهتى فى التراب ساجدا اواجالس اقواما يلتقطون طيب القول كما يلتقطون طيب الثمر لسرنى ان اكون لحقت بالله

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইরশাদ করেন, যদি তিনটি বস্তু দুনিয়াতে না থাকতো তাহলে আমার জন্য অতি দ্রুত আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়াই উত্তম হতো। বস্তু তিনটি হল– ১. আল্লাহ তা'আলার রাহে সফর তথা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। ২. সিজদা অবস্থায় আপন চেহারা ও কপাল ধূলি মিশ্রণ করা। ৩. ঐ সকল লোকদের সোহবত যারা উত্তম কথা বলে এবং উত্তম ফল বের করে।

উদ্দেশ্য হল, যদি জিহাদ, নামায ও ভাল মানুষের সংস্পর্শ দুনিয়াতে না থাকতো তাহলে এ জীবনে কোনই মজা থাকত না। এ অবস্থায় জীবিত থাকার চেয়ে ঈমানের সাথে মৃত্যুই শ্রেয় হতো।

كان عمر رضى الله عنه يحب الصلوة فى جوف الليل يعنى وسط الليل

হযরত উমর ফারুক (রা.) মধ্য রাতে নামায পড়াকে অত্যাধিক পছন্দ করতেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বাণী

قال ابن عمر حين حضرته الوفاة ماسى على شئ من الدنيا الاعلى ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وانى لم اقاتل هذه الفئة الباغية التى نزلت بنا يعنى الحجاج

হযরত ইবনে উমর (রা.) মৃত্যুকালীন সময় ইরশাদ করেন, দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্য আমার আফসোস হচ্ছে না, তবে শুধু আফসোস হচ্ছে গরমের ঐ সমস্ত দিন যা রোযা বিহীন অতিবাহিত হয়েছে এবং রাতের ঐ সময় যা ইবাদত ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে। আর হিজাজে আত্মপ্রকাশকারী বাগী দমনের সুযোগ আসার পর যে সময়টুকু তাদের সাথে জিহাদ ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বাণী

قال عمرو بن العاص رضى الله عنه ركعة بالليل افضل من عشر بالنهار

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ইরশাদ করেন, রাতের এক রাকা'আত নামায দিনের দশ রাকা'আত নামাযের চেয়ে উত্তম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাণী

قال ابن عباس رضى الله عنه شرف الرجل قيامه بالليل وغناه استغناء عما فى ايدى الناس

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেন, মুসলমানদের ফযিলত ও বুযুর্গী হল রাত্রি জাগরণের মাঝে। এ ইবাদতই বিত্তবানদের বিত্ত মোহ থেকে দূরে রাখে।

قيامه بالليل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত্রে জেগে নামায পড়া। অর্থাৎ মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান এটাই যে, সে তাহাজ্জুদ পড়বে। মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করবে না এবং তা থেকে বিমুখ থাকবে। মূলত এটাই হলো প্রকৃত স্বচ্ছলতা।

হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর বাণী

عن سلمان الفارسى رضى الله عنه بات رجل يعطى القيان البيض فى سبيل الله حتى الصباح وبات رجل يذكر الله اويقرء القران لرايت ان ذاكر الله افضل

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি সারা রাত্র শুভ্র বাদী আল্লাহ তা'আলার রাহে সদকা করে আর অপর ব্যক্তি যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকে, তবে আমার নিকট যিকির ও তিলাওয়াতকারীই উত্তম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাণী

এক.

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ينبغى لحامل القران ان يعرف بليله اذالناس نائمون وبنهاره اذالناس مفطرون وبحزنه اذالناس يفرحون وبخشوعه اذالناس يختالون وبورعه اذالناس يخلطون وبصمته اذالناس يخوضون وببكائه اذالناس يضحكون

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইরশাদ করেন, হাফেযে কুরআনদের উচিত তারা যেন রাতের হকের ব্যাপারে সচেতন হয়, যখন দুনিয়াবাসী আরাম নিদ্রায় বিভোর থাকে এবং তারা যেন দিনকে রোযার দ্বারা অতিবাহিত করে যখন অন্য মানুষ ইফতার করে। নিজেকে চিন্তা ও পেরেশানিতে নিমজ্জিত রাখে যখন অন্যরা আনন্দ-স্ফূর্তিতে সময় অতিবাহিত করে। আর নিজে খুশু-খুযুর সাথে থাকবে, যখন মানুষ সম্পূর্ণ রূপে তা পরিহার করে। নিজেকে তাকওয়া-পরহেযগারীতে পরিপূর্ণ রাখবে যখন মুসলমান তার থেকে উল্টো দিকে চলে। নিজের যবানকে চুপ রাখবে, যখন মানুষ বেপরওয়াভাবে কথোপকথনে লিপ্ত থাকে। নিজে ক্রন্দন করতে থাক যখন মানুষ হাসতে থাকে।

দুই.

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لاالفين حدكم جيفة ليل قطرب نـــهار

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইরশাদ করেন, আমি যেন তোমাদের মধ্য হতে কাউকে রাতে মুরদার এবং দিনের বেলা কুতরব না দেখি।

কুতরব একটি পাখির নাম, যে সারা রাত্র শুধু ঘুরাফিরার মাঝে থাকে। এ উক্তির মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বুঝাতে চেয়েছেন, হে মুসলমান! তোমাদের মধ্যে যেন কেউ এমন না হয় যে, সারা রাত্রি গাফলতী ও নিদ্রাবস্থার কারণে মুরদারের মতো অতিবাহিত না হয়। আর সারা দিন কুতরব পাখির মতো দুনিয়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে অতিবাহিত না হয়। দিবা-রাতি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে এবং বিশেষ করে রাতে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে নিজেকে সতেজ রাখবে।

তিন.

عن ابن مسعود رضى الله عنه حسب الرجل من الخيبة اومن الشران ينام لبلة حتى يصبح وقدبال الشيطان فى اذنه فلم يذكرالله ليلة حتى يصبح

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইরশাদ করেন, মানুষের ধ্বংসের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সারা রাত নিদ্রায় বিভোর থাকে, এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায়ই সকাল হয়ে যায় এবং শয়তান তার কানের মাঝে এসে পেশাব করে দেয়। সে সারারাতের সামান্য সময়ও আল্লাহ তা'আলার যিকির করেনি, সকাল হয়ে যায়।

চার.

قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فضل صلوة الليل على صلوة النهار كفضل صدقة السرعلى العلانية

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাতের তাহাজ্জুদ নামায দিনের নফল নামায অপেক্ষা এত অধিক উত্তম যেমন গোপনে সদকা করা প্রকাশ্যে সদকা করা অপেক্ষা উত্তম।

কুরআন ও হাদীসে গোপনে সদকার অত্যাধীক ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রকাশ্য সদকার মাঝে পাওয়া যায় না। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের ভয়াবহ দিন যখন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন গোপনে সদকাকারী আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়াতলে ছায়া লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাহাজ্জুদ

আধুনিক সভ্যতার এ উন্নততর যুগে বৈজ্ঞানিক সাধনার ফলে সারা বিশ্ব যেন একটি গ্রাম বা মহল্লায় পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবী যেন মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সারা বিশ্বের ঝটিল ও দুর্লভ সব সংবাদ ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্ব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ ধারা যখন এমনিভাবে অব্যাহত, মানুষ যখন যান্ত্রিক সভ্যতার ফলশ্রুতিতে বিস্ময়মুগ্ধ, ঠিক সে সময় দেখতে পাই আজও বিশ্বে বিদ্যমান রয়েছে মানুষে মানুষে হানাহানি। সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে কলহ, এমনকি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন, বিশ্ব মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধন আধুনিক সভ্যতার প্রবক্তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তারা বিশ্বসৃষ্টিকে আংশিকভাবে জয় করতে সক্ষম হলেও নিজেকে জয় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এ কারণেই বর্তমান সময়ে সকলে দিশেহারা, দুনিয়া ব্যাপী সুখ-সামগ্রী রয়েছে পর্যাপ্ত কিন্তু শান্তি নেই সামান্যটুকুও। এ শান্তির ও কল্যাণের, সত্য ও ন্যায়ের, সুবিচার ও পরোপকারের দয়ামায়া এবং মমত্ববোধের পরস্পরের সহযোগিতা ও সহানুভূতির, সততা ও ন্যায় পরায়ণতার পয়গামই বহন করে এসেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি শুধু সিংহাসনে বসে হুকুম করেননি বা থিউরী বলে অন্যের মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করেননি। বরং তিনি সমস্ত কিছুই সর্বপ্রথম নিজে আমল করে পরে অপরকে হুকুম প্রদান করেছেন।

নিঃষ্পাপ, মাসুম হওয়া সত্ত্বেও কখনো এই চিন্তা করেননি যে, আমি সামান্য আরাম করে নিই অন্যরা ইবাদত করুক, জিহাদ করুক ইত্যাদি।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এত পরিমাণ ইবাদত করতেন যে, পা মুবারক ফুলে ফেটে যেত। সাহাবায়ে কিরাম আরয করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, তথাপি আপনি এত কষ্ট করেন কেন? তাঁদের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি শুকরগুযার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পা মুবারক ফুলে যেত

عن ابى هريرة رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حتى ترم قدماه قال فقيل له تفعل هذا وقدجاءك ان الله تعالى قدغفرلك ماتقدم من ذنبك وماتاخرقال افلا اكون عبدا شكورا

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশী পরিমাণে নামায পড়তেন যার ফলে তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? -শামায়েলে তিরমিযী

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুকরিয়া সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে হযরত আতার আবেদনে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার জন্য গৃহে আগমন করলেন এবং আমার সাথে লেপের নীচে শুয়ে পড়লেন। শোয়ার ক্ষাণিক পরই তিনি বলে উঠলেন, আমাকে যেতে দাও। আমি আমার প্রভুর ইবাদত করব। এই বলে তিনি বিছানা থেকে উঠে গেলেন, তারপর কান্না জুড়ে দিলেন। এমনকি চোখের পানির প্রবাহে বক্ষ পর্যন্ত ভিজে গিয়েছে। তারপর রুকু করলেন। সেখানেও কাঁদতে লাগলেন। তারপর সিজদায় গেলেন, সেখানেও কান্নাকাটি অব্যাহত রয়েছে। তারপর

সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখনও কাঁদতে ছিলেন। মোট কথা, সকাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। এমনকি হযরত বিলাল (রা.) ফজরের নামাযের জন্য ডাকতে আসার সময়ও।

আমি (হযরত আয়োশা) জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এত বেশী ক্রন্দন করছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা তো আপনার আগে পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তবে কি আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরকারী বান্দা হব না? তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন কেন করব না অথচ আজ আমার উপর এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

অতঃপর তিনি সূরা আল-ইমরানের শেষ রুকু থেকে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَـٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَـٰتٍ لِأُوْلِى الْأَلْبَـٰبِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত-বন্দেগীতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত খুশী হয়ে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'আবদ' শব্দের প্রিয় পদবী দ্বারা তাঁকে স্মরণ করেছেন। -ফাযায়েলে তাহাজ্জুদ-৭৬

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার নামায পড়ার সুযোগ ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন। আমি মনে করেছি তিনি একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করবেন। কিন্তু তিনি একশত আয়াত শেষ করে সামনে বাড়লেন। এবার আমি মনে করলাম সম্ভবত তিনি প্রতি রাকাতে এক একটি সূরা শেষ করতে চান। অথচ তিনি যখন সে সূরা শেষ করলেন সাথে সাথে সূরা আল ইমরান আরম্ভ করলেন। আল-ইমরান শেষ হয়ে গেলে সূরা নিসা আরম্ভ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক থেমে থেমে অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সাথে কিরাত পাঠ করছিলেন এবং প্রত্যেক আয়াতের বিষয়বস্তু অনুযায়ী মাঝে মধ্যে 'সুবহানাল্লাহ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও অন্যান্য

দু'আ পাঠ করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। রুকুর মধ্যেও কিয়ামের সমপরিমাণ সময় অবস্থান করলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে সে পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গেলেন। সিজদার মধ্যেও ঐ পরিমাণ সময় বিলম্ব করলেন। -মুসলিম শরীফ

তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে যিকির করা

বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে প্রথমে মহান রাব্বুল আলামীনের যিকির করা উত্তম। সে যিকির তিলাওয়াতে কালামে পাকের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন দু'আ দরূদের মাধ্যমে হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের আমল এমনই ছিল।

হযরত হুযাইফা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাহাজ্জুদ নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে পড়লেন–

الله اكبرذوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারা শেষ করে রুকু করলেন। তাঁর রুকু আনুমানিক কিয়ামের পরিমাণ লম্বা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে :

سبحان ربى العظيم – سبحان ربى العظيم

পাঠ করলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন। এখানেও প্রায় রুকুর পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে তিনি পড়লেন–

لربى الحمد – لربى الحمد

তারপর সিজদা করলেন। তাঁর সিজদাও প্রায় দাঁড়ানো পরিমাণ সময় দীর্ঘ ছিল। তিনি সিজদার মধ্যে–

سبحان ربى الاعلى

পড়লেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দু'সিজদার মাঝে সিজদার পরিমাণ সময় বসলেন এবং

رب اغفرلى – رب اغفرلى

বারবার পাঠ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ নামাযের মধ্যে সূরা বাকারা, সূরা আল-ইমরান, সূরা নেসা ও সূরা মায়েদা কিংবা সূরা আন'আম পাঠ করলেন। -শামায়েলে তিরমিযী

কালামের পাকের তিলাওয়াত

কিয়ামুল লাইল নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন–

ان ابن عباس رضى الله عنه اخبره انه بات عند ميمونة ام المؤمنين هى خالته قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل اوقبله بقليل اوبعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرءالعشر الايات الخواتم من ال عمران ثم قام الى شن معلقة فتوضأ منها

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি কোন এক রাত্রিতে আমার খালা উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)-এর গৃহে ঘুমিয়ে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘুমিয়ে ছিলেন সে গৃহে। মধ্যরাতে অথবা তার চেয়ে সামান্য আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে উভয় হস্ত মুবারককে চেহারা বুলিয়ে দিয়ে ঘুমের প্রভাব দূরীভূত করলেন। অতঃপর সূরা আল ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অবশেষে পানিতে পরিপূর্ণ মশকের দিকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং তার থেকে ছোট্ট পাত্রে পানি নিয়ে অযু করলেন।

উল্লেখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার পর সামান্য কিছু কুরআন তিলাওয়াত করে নেয়া উত্তম। বিজ্ঞ

ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন যে, সূরায়ে আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করা মোস্তাহাব।

দু'আ-দরূদের মাধ্যমে যিকির করা

একটি বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে প্রথমে এ দু'আ পাঠ করতেন–

لااله الاانت سبحانك اللهم انى استغفرك من ذنبى واسألك رحمتك اللهم زدنى علماولاتزغ قلبى بعد اذهديتنى وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি সমস্ত কিছু থেকে পবিত্র। হে আল্লাহ! আমি সমস্ত গুনাহ থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার রহমতের পূর্ণ প্রত্যাশা করছি। হে পরওয়ারদিগার! আমার ইলমে বরকত দান করুন, হিদায়েতের পর আমার অন্তরকে বক্র করে দিয়েন না। আমাকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বাধিক দাতা।

হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনা

উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে এ দু'আ পাঠ করতেন–

رب اغفروارحم وهدنى السبيل الاقوم

হে আমার প্রতিপালক! আমার উপর রহমত দান করুন, আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে সরল পথে পরিচালিত করুন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা

উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিকালীন সময় তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে এ দু'আ পাঠ করতেন–

لااله الا الله الواحد القهار رب السموت والارض ومابينعما العزيز الغفار

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, প্রতাপশালী, সমস্ত কিছুর লালনকারী, সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান, ক্ষমাকারী।

ক্ষমার অপর এক দু'আ

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে এ দু'আ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার পরবর্তী সমস্ত দু'আ কবুল করবেন। দু'আটি হল–

لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شئ قدير سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله

আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব কেবল তাঁরই জন্য এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই জন্য। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি পবিত্র, সমস্ত প্রসংশার একমাত্র উপযুক্ত। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই পক্ষ হতে প্রদত্ত।

উপরোক্ত দু'আটি পড়ে رب اغفرلى বলে যে কোন জায়েয দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুল করেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ননা

একদা উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাস করা হল– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করতেন? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الله اكبرو : الحمدلله : سبحان : لااله الاالله দশ দশবার করে পড়তেন। অতঃপর দশবার ইস্তিগফার ও দশবার এ দু'আ পড়তেন– اللهم اغفرلى واهدنى وارزقنى

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, সত্য পথের সন্ধান দিন এবং উত্তম রিযিক প্রদান করুন।

তারপর দশবার এই দু'আ– اللهم انى اعوذبك من ضيق يوم الحساب

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কিয়ামত দিবসের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

সাহাবায়ে কিরামের তাহাজ্জুদ

হযরত আলী (রা.)-এর এক শাগরেদ বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলী (রা.) ফযরের নামায আদায় করে ডান দিকে চেহারা ফিরিয়ে বসলেন। এমতাবস্থায় যে, তার চেহারা মুবারকের মাঝে চিন্তা-পেরেশানির চিহ্ন ছিল। সূর্য উদয় পর্যন্ত তিনি এ অবস্থাতেই বসেছিলেন। অতঃপর অত্যন্ত জোশের সাথে নিজের হাত নাড়লেন এবং বললেন, খোদার কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের যেমন দেখেছি তার কিছুই আজ দৃষ্টিতে আসছে না। তাঁদের প্রভাত এমতাবস্থায় হত যে, সকলের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, মুখমণ্ডল ধূলিমাখা অবস্থায় তারা সারা রাত্রি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদাতে থাকতেন। দাঁড়িয়ে কুরআন পাক তিলাওয়াত করতেন। এত অধিক পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, পা ফুলে ফেটে যেত। কখনো এক পা ঠেক লাগিয়ে কখনো বা আবার দুই পা ঠেক লাগিয়ে নামায আদায় করতেন। তারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করা অবস্থায় এমনভাবে ঝুমতেন যেমন বাতাসে গাছের পাতা ঝুমে থাকে। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁরা এ পরিমাণ ক্রন্দন করতেন যে, তাদের চোখে নহর প্রবাহিত হয়ে যেত। কিন্তু অতীব আফসোসের বিষয় হল আজ মানুষ সব গাফলতির মাঝে রাত্র অতিবাহিত করে।

হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনা তখনকার তাবেঈদের লক্ষ্য করে। আল্লাহ তা'আলা জানেন, এখনকার অবস্থা যদি সাহাবায়ে কিরাম দেখতেন, তাহলে কতই না আশ্চর্য হতেন। আমাদের প্রেরণাকে শানিত করার লক্ষ্যে নিম্নে সাহাবায়ে কিরামের তাহাজ্জুদের কয়েকটি বিবরণ তুলে ধরছি।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

আমিরুল মুমিনীন সায়্যেদেনা হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলামের ইতিহাসে সর্বজনীন শ্রদ্ধেয় নাম। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যেদিন হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে ইসলামের সম্মান ও প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল যেন ইসলামের জয়ের প্রতীক। তাঁর হিজরত ছিল যেন একটি নুসরাত বা বিরাট সাহায্য। তার ইমামত বা নেতৃত্ব ছিল একটি রহমত। কা'বা শরীফ গিয়ে নামায আদায় করার সাধ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু যখন হযরত উমর ফারুক (রা.) ঈমান আনেন, তখন তিনি মুশরিকদের সাথে এমন বাক-যুদ্ধ বাধিয়ে দেন যে, আমাদের জন্য কা'বা শরীফে নামায আদায়ের বাধা অপসারিত হয়। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, যখন থেকে হযরত উমর (রা.) ঈমান আনেন তখন থেকে ইসলাম যেন একজন ভাগ্যবান মানুষের রূপ নেয়। প্রতিটি পদে সে উন্নতি লাভ করতে থাকে। আর যখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন তখন ইসলামের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ নেমে আসে এবং প্রতিপদেই উন্নতি ব্যাহত হতে থাকে। ইমাম নববী (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) প্রত্যেক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে তিনি স্বীয় স্থানে অটল ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি রূপসী কন্যা জান্নাতের এক প্রাসাদের পাশে বসে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? সে বলল, এটি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, তোমার গায়রাত (লজ্জাবোধ)-এর কথা আমার মনে পড়ল এবং আমি সেখান থেকে ফিরে আসি। হযরত উমর (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার সাথে আমার কিসের গাইরত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তবে নিশ্চয়ই উমরই হতো। অন্যত্র নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, উমর ফারুক

জান্নাতবাসীদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ। উপরোক্ত মর্যদা সম্পন্ন ব্যক্তির কি প্রয়োজন ছিল তাহাজ্জুদের? কিন্তু উমর ফারুক (রা.) জান্নাতের নিশ্চিত গ্যারান্টি পাওয়ার পরও জীবনে তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করেননি। প্রত্যেহ ইশার নামায আদায় করে আপন গৃহে যেতেন এবং সেখানে সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করতেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আব্বাজী সারা রাত্র অত্যন্ত খুশু-খুযু ও ধীরস্থিরতার সাথে নামায আদায় করতেন। যখন তাহাজ্জুদের সময় শেষ হওয়া নিকটবর্তী হত তখন ঘরের সকলকে জাগ্রত করতেন এবং এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করতেন–

وامراهلك بالصلوة والصطبر عليهالانسئلك رزقاه نحن زن قلك و

العاقبةللتقوى

'নিজ গৃহবাসীকে নামাযের হুকুম প্রদান কর এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমাদের নিকট রিযিক প্রত্যাশা করছি না, রিযিক তো আমি প্রদান করবো। উত্তম প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্য।'

এ মহান বুযুর্গ রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন আযাবের আয়াত আসলে পেরেশানীতে বেহুশ হয়ে যেতেন। কয়েক দিন পর্যন্ত তার প্রভাব থাকত এবং তাকে অসুস্থ ব্যক্তির তিমারদারীর ন্যায় তিমারদারী করতে হত। এ মহান ব্যক্তিত্ব শাসনকালে দিবা-রাত্রি কখনো ঘুমুতে পারতেন নি। কখনো কখনো বসে বসে নিদ্রা যেতেন এবং বলতেন, আমি যদি রাতে ঘুমাই তবে নিজের জন্য ক্ষতিসাধন হয়। আর যদি দিনের বেলা ঘুমাই তবে প্রজাদের জন্য ক্ষতিসাধন হয়। আমি এ দু'টির কোনটির ক্ষতিসাধন করতে পারিনা বিধায় দিবা-রাত্রি কখনো শোয়ার সুযোগ নেই।

হযরত উসমান গনি (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। লজ্জার চাদরে আচ্ছাদিত ছিলেন তিনি। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একদা হযরত উসমান আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল! এমন সময় একজন ফিরিশতা আমাকে বলল, তাঁকে দেখলে আমি লজ্জায়

কুঞ্চিত হয়ে পড়ি। কেননা, তাঁকে তাঁর জাতির লোকেরাই হত্যা করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেভাবে হযরত উসমান মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লজ্জা (সমীহ) করে, ফিরিশতাগণও তাকে তেমনি লজ্জা (সমীহ) করে।

হযরত উসমান (রা.) 'যূ-হিজরাতাইন' বা 'জোড় মাহাজির' ছিলেন। কারণ তিনি প্রথমে আবিসিনিয়া ও পরে মদীনা তৈয়্যিবায় হিজরত করেন। আকার-আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর অনেক মিল ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভের পূর্বেই আপন কন্যা হযরত রুকাইয়াহ (রা.)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। বদর যুদ্ধের দিন হযরত রুকাইয়াহ (রা.) ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে তার সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তিনি 'যুন্নূরাইন' দুই নূরের অধিকারী।

সাহাবায়ে কিরামদের মাঝে তিনি যেমন ছিলেন প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক তেমনি ছিলেন সর্বাধিক বদান্য ও মহান আল্লাহ তা'আলার রাহে দানশীল। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেও বদরের পূর্ণ গনিমত লাভ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উসমান 'আসহাব-ই-বদরের' বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন, আজকের এ দিনের পর উসমান (রা.) মুক্ত, তথা তিনি যদি সারা জীবনে আর কোন আমল নাও করেন তবু আজকের এ আমল তাঁর নাজাতের জন্য যথেষ্ট। এতসব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ মহামানব ইবাদতের গভীরে নিমগ্নতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সারা রাত্রি তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বছরের পর বছর রোযা রাখতেন। কখনো রাতের শুরু অংশে সামান্য আরাম করতে গেলেও অল্প সময়ে তা সেরে সারা রাত্রি তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করতেন।

এ মহামানব বেতেরের এক রাকা'আতে পুরা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আনাস (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আনাস (রা.) অত্যন্ত বিখ্যাত সাহাবী। পিতার নাম মালেক ইবনে আবুন নাদর। তিনি ১২৮৬ টি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত সাঈদ ইবনে হিলাল (রা.) বলেন, হযরত আনাস (রা.)-এর নিকট একটি স্বহস্তে লেখা হাদীস সংকলন ছিল। তিনি তা মাঝে মাঝে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনেছি এবং তা লিখে নেয়ার পর তাঁকে পড়ে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি। এ মহামানব দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন। বহুবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার জন্য দু'আ করেছেন। এ সত্ত্বেও হযরত আনাস (রা.) সারা রাত্রি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এতই লম্বা সময় তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করতেন যে, পাদ্বয় ফেটে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) সর্বদা রাত্রি জাগরন করতেণ। কখনো সারা রাত্র রুকুতে আবার কখনো সারা রাত্র সিজদাতে অতিবাহিত করতেন। এক রাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করতেন। এই বুযুর্গ মসজিদে অধিক পরিমাণ অবস্থান করতেন। তাই তাকে حمام المسجد উপাধি দেওয়া হয়েছে।

হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রা.) সমগ্র রাত্রি জেগে ইবাদত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবহিত হলে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করছ? হযরত উসমান (রা.) বললেন, খোদার কসম হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এমনটি নয়। আমি আপনার

সুন্নাতের এক অনুসন্ধানী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি ঘুমাই। নামায পড়ি। রোযা রাখি আবার ইফতারও করি। হে উসমান! আল্লাহকে ভয় করো, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। তোমার আত্মীয়দের হক রয়েছে এবং তোমার শরীরেরও হক রয়েছে। বিধায় তুমি রোযা রাখো, মাঝে মাঝে ইফতারও করো। নামায পড়ো সাথে কিছু সময় আরামও করো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাত্রিবেলা সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে যওয়ার পর নিজের সমস্ত ওয়াজিফা আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হতেন। সকাল পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজে ওয়াজিফা আদায় করতেন। কুরআন তিলাওয়াত এতই আস্তে করতেন যে, অন্য কারো যাতে ঘুম নষ্ট না হয়।

হযরত আবু যর (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত আবু যর (রা.) অত্যন্ত বিখ্যাত ও অধিক প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি প্রত্যেহ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন। তাতে তাঁর যে পরিমাণ সময় ব্যয় হতো তিনি নামাযেই দণ্ডায়মান থাকতেন।

হযরত উমর ইবনে আতবা (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত উমর ইবনে আতবা (রা.) একদা ইশার নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর নিজ গৃহে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে যখন وانذرهم يوم الازفة পর্যন্ত পৌছে ক্রন্দন করতে থাকেন। এমন কি জমিনে লুটিয়ে পড়েন। বহুক্ষণ পর হুশ ফিরে আসল। তারপর আবার এ আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন। এমন কি সকাল হয়ে যায়। এ মহান বুযুর্গ কখনো সারা রাত্র শুধু রুকু অবস্থায় আবার কখনো সারা রাত্র শুধু সিজদা অবস্থায় অতিবাহিত করতেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

অত্যন্ত প্রশিদ্ধ সাহাবী হযরত তলহা (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মদ (রা.) এত অধিক পরিমাণ ইবাদত ও মুজাহাদা করতেন যে, তাঁরা উপাধি হয়ে গিয়েছিল سجاد অধিক সিজদাকারী। তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি যাকে سجاد বলে ডাকা হতো। সারা রাত্রি তাহাজ্জুদের সিজদায় কাটিয়ে দিতেন।

হযরত কাহমাসুল হেলালী (রা.)

হযরত কাহমাসুল হেলালী (রা.) নিজ মাতৃভূমিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে জানিয়ে গেলেন। নিজ ভূমিতে গিয়ে তিনি পূর্ণ এক বছর রাত্রি জেগে ইবাদত করলেন এবং সারা দিন রোযা রাখলেন। দ্বিতীয় বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবার তাঁর মাথা হতে পা পর্যন্ত দেখতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারছেন না। অবস্থা দেখে হযরত কাহমাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ! তুমি কে? তিনি বললেন, আমি কাহমাসুল হেলাল। গত বছর আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। এ বছর আমি একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এমন হওয়ার কারণ কি? উত্তরে কাহমাস (রা.) বললেন. গত বছর উপস্থিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিক রাত্রি জাগরণ এবং সমস্ত দিন রোযা রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে এ পরিমাণ কষ্ট করার হুকুম কে দিয়েছে? মাসে একটি রোযাই যথেষ্ট। হযরত কাহমাস (রা.) বললেন, তার চেয়েও অধিক রোযা রাখার ক্ষমতা আমার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ভাল তিনটি রাখ।

হযরত তামীম ইবনে আউস (রা.)-এর তাহাজ্জুদ

হযরত তামীম ইবনে আউস (রা.) এক রাকা'আতে পুরো কুরআন পাক খতম করতেন। আবার কখনো এক আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে পুরা রাত্রি অতিবাহিত করে দিতেন। একদা এ বুযুর্গের কোন এক কারণে তাহাজ্জুদের নামায ছুটে যায়। যার ফলে তিনি শাস্তিস্বরূপ একাধারে এক বছর বিছানায় পিঠ রাখেন নি।

হযরত মিদাদ ইবনে আমর (রা.)

হযরত মিদাদ ইবনে আমর (রা.) যখন নিজ বিছানায় বিশ্রামের জন্য গমন করতেন, তখন তিনি পেরেশানীর সাথে এদিকে সেদিক লুটোপুটি খেতেন। নিদ্রা চক্ষু থেকে উধাও হয়ে যেত। তিঁনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা দোযখের ভয় আমার আমার চক্ষু হতে ঘুমকে দূর করে দিয়েছে। নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করতেন।

আকাবিরগণের তাহাজ্জুদ

তারাই মোদের পূর্বসূরী যাদের নিয়ে গর্ব করি। আকাবিরগণের শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্বের বর্ণনা লিখে শেষ করার নয়। তাদের এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এমনিতে হয়ে যায়নি, ইতিহাস তাদের অনন্তকাল যাবত শুধুই স্মরণ রাখেনি; বরং তার পিছনে রয়েছে মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম কৃপা ও তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন মুজাহাদা। বহু বুযুর্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই তাঁরা বছরের পর বছর আরামের বিছনায় আপন পিঠ স্পর্শ করেননি। আরামের ঘুমকে হারাম করে প্রভুপ্রেমে দণ্ডায়মান থাকতেই অধিক তৃপ্তি লাভ করতেন। কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাদের অমীয় সুধা পানের ন্যায়। প্রভুর দরবারে দু'আয় মগ্ন হয়ে কাটিয়ে দিতেন সারা রাত। এমনই কিছু আত্মত্যাগী আকাবিরের অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করছি।

পঞ্চাশ বছর ইশার অযুতে ফযর নামায আদায়

এক.

সাহাবায়ে কিরামের সোনালী যুগের পরক্ষণেই যারা ইসলামের ঝাণ্ডাকে আকড়ে ধরেন আপন বাহু দ্বারা, কুরআন ও হাদীসের সুরক্ষায় বিসর্জন দিয়েছেন নিজেদের সকল ভোগ-বিলাস তাদেরই অন্যতম, তাবেঈদের মাঝে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, সেকালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.)। এ মহান বুযুর্গ আল্লাহ তা'আলার ভয় ও পরকালের চিন্তায় এতই পেরেশান ছিলেন যে, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দ্বারা ফযরের নামায আদায় করেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর রাত্রি বেলা নামায, কুরআন তিলাওয়া ও হাদীসে মোতালায় অতিবাহিত করেছেন। রাত্রিবেলা একবিন্দু পরিমাণ ঘুমাতে যাননি।

দুই.

মাযহাবে আরবার অন্যতম ইমাম ইমামে আযম (রহ.) ত্রিশ/চল্লিশ/পয়তাল্লিশ/পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ফযরের নামায ইশার অযু দ্বারা আদায় করতেন। কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন যে, ইমামে আযম (রহ.) দুই রাকা'আতে পুরা কুরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। তিনি শুধু যোহরের পর সামান্য সময় বসে বসে ঘুমাতেন। কোন কোন রাত্রে তিনি শুধু فمن الله عليناووقاناعذاب السموم পাঠ করে সারারাত অতিবাহিত করে দিতেন। কোন রাতে শুধু والساعةادهيوامر পাঠ করে সারারাত অতিবাহিত করতেন।

চল্লিশ বছর ইশার অজুতে ফযর নামায আদায়

এক.

রাতের তিমিরতা কারো জন্য নিয়ে আসতো রহমত ও সৌভাগ্যের বার্তা, আবার কারো জন্য নিয়ে আসতো গযব ও দুর্ভাগ্যের অমানিশা। অপরাধী-পাপিষ্ঠদের জন্য রাতের সময়টি হলো ক্লেশিত হৃদয়ে তিমিরতা বৃদ্ধির উপযুক্ত সময়, আর আল্লাহওয়ালা, বুযুর্গদের জন্য হল নৈকট্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ। সূর্যাস্তের সাথে সাথে তাদের হৃদয় গহীনে উদিত

হতো প্রভুপ্রেমের নবসূর্য। বুযুর্গানে দীন রাত্রিকালীন সময়কে গনিমত মনে করতেন। হযরত আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) ছিলে, সে সকল বুযুর্গের অন্যতম। তাঁর বিবি বর্ণনা করেন, চল্লিশ বছর যাবত আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ রাতে তাঁর বিছানায় আরাম করেন নি। সারা রাতই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত করেন।

দুই.

হযরত সোলাইমান তাইমীয়া (রহ.) চল্লিশ বছর পর্যন্ত বসরার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি এ চল্লিশ বছরই ইশার অযু দ্বারা ফযরের নামায পরাতেন।

তিন.

হযরত রোকায়া বিনতে মাসকালা (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি মহান রাব্বুল আলামীনকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তখন শুনেছি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, আমি অবশ্যই অবশ্যই সোলাইমান তামীমি (রহ.)-এর ঠিকানা উত্তম করবো। কেননা সে আমার জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দ্বারা ফযর নামায আদায় করেছে।

চার.

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদের (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি আমার নফসকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কষ্টে নিমজ্জিত করেছি। এতে করে সে একেবারে সোজা হয়ে গেছে।

এক হাজার রাকা'আত নফল আদায়

কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণকারী নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.)-এর আদরের দুলাল হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রহ.) জীবনে কখনো তাহাজ্জুদের নামায কাজা করেননি। তিনি নিজগৃহে অবস্থানকালে এবং সফরের অবস্থায় সমানভাবে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। আল্লামা যাহাবী (রহ.) এ বুযুর্গ সম্পর্কে লিখেন যে, তিনি দিবা-রাত্রি এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত এ আমলের উপর অবিচল ছিলেন। অধিক আমল করার কারণে তাঁকে জয়নুল আবেদীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

সারা রাত্রি দু'আতে অতিবাহিত করা

মসজিদে নববী! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের পদচারণায় ধন্য যে জমিন, যার মাঝে সামান্য ইবাদতই পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে অধিক সাওয়াব। সে মুবারক মসজিদে ইশার নামায আদায় করে হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রহ.) রওনা হতেন আপন গৃহমুখে। পথিমধ্যে হঠাৎ কোন একটি দু'আ স্মরণ হয়ে যেত, সাথে সাথে সে স্থানে দাঁড়িয়েই হাত উত্তোলন করতেন এবং মহান প্রতিপালকের শাহী দরবারে দু'আ করতেন প্রাণ উজাড় করে। কি সে আকুতি! দুনিয়ার সব ভুলে যেতেন তিনি। তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের মাঝে থাকত না কোন প্রকার অন্তরায়, যেন মসজিদ থেকে গৃহে যাওয়া অবস্থায় পথিমধ্যে পেয়ে গেছেন দু'আ কবুলকারী মহান প্রভুকে। আর তিনি সুযোগকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে লুটিয়ে পড়ছেন স্রষ্টার কুদরতী চরণে। তাঁর এ দু'আ সমাপ্ত হতো ফযরের আযান শুনে। অপূর্ব সে দৃশ্য! ফযরের আযান তাঁর চেতনা ফিরিয়ে দিত। আযান শেষ হতেই আবার ছুটে যেতেন মসজিদে নববীতে। ফরয আদায়ে পেরেশানিতে বিবর্ণ হয়ে যেত চেহারা। তিনি ইশার অযু দ্বারাই ফযরের নামায আদায় করতেন।

সারা রাত্রি ইবাদত করা

এক.

হানাফী মাযহাবের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। তাই বিশ্বের বহু মুসলমানকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হতে দেখা যায়। এই মাযহাবে কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করে অতি সহজভাবে মানুষের কাছে পেশ করা হয়েছে, যা মানব-স্বভাবের খুব কাছাকাছি হওয়ায় মানুষ স্বভাবগতভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। শুধু নামায, রোযা, হজ, যাকাতের ব্যাপারেই নয়; বরং মুআমালাত অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেনা-পাওনা, বিচার ও রাষ্ট্র শাসন ইত্যাদি মানুষের জীবনের প্রয়োজীয় সকল বিষয়েই হানাফী মাযহাবে দিকনির্দেশনা ও আইন-প্রণয়ন করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সহজ অথচ সঠিক মাসআলা পেশ করা এই মাযহাবের ইমাম হযরত আবু হানীফা

(রহ.)-এর অমর কীর্তি। তাঁর রাত্রিকালীন ইবাদত সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামগণ বর্ণনা করেন যে, তিনি জীবনের প্রথম দিকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ইবাদত করতেন। অতঃপর একদা কোন এক জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেলেন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর প্রতি ইশারা করে বলছে যে, এই ব্যক্তি সারা রাত্রি ইবাদত করে। তারপর থেকেই এ বুযুর্গ সারা রাত্রি ইবাদত করতে শুরু করেন। কারণ লোকদের নেক ধারণা যাতে মিথ্যা না হয়।

এ মহান বুযুর্গ সম্পর্কে হযরত আবু জুয়াইবিয়া (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর খিদমতে একাধারে ছয় মাস অবস্থান করেছি। এ ছয় মাসে কোন দিন রাতে আরামের জন্য বিছানায় যেতে দেখিনি। অর্থাৎ তিনি সারা রাত্রি ইবাদত– বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন।

দুই.

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) রাত্রি বেলা অযু সেরে নিজ স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেন যে, আজ আপনার কোন খেদমতের প্রয়োজন রয়েছে কি! যদি স্বামী বলতেন যে প্রয়োজন নেই, তাহলে তিনি নামাযে দাড়ীয়ে যেতেন সকাল পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতেন। রাতের এক প্রান্তে এ দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! দুনিয়াবাসী সব নিদ্রামগ্ন, তারকারাজি নির্বাপিত, দুনিয়ার প্রতাবশালী বাদশাহদের সবকটি দরওজা বন্ধ। হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনার দরওজা উন্মুক্ত, খোলা রয়েছে। আপনি দয়া করে আমাকে মা'ফ করে দিন। অতঃপর নামাযের স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে বলতেন। হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জত জালালাতের শপথ! যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব প্রত্যেহ প্রভাত পর্যন্ত আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। (ইনশাআল্লাহ)

হযরত ইবনে যিয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাবিয়া বসরী (রহ.) দীর্ঘ এক সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। তিনি দিবা-রাত্রি সর্বদা নামায আদায় করতেন। সারা দিন নফল ও সারা রাত তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করেন।

তিন.

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) রমযান মাসে সারাদিন জমিতে পরিশ্রম করতেন এবং সারা রাত্রি নফল নামায আদায় করতেন। পুরা মাসেই কোন প্রকার আরাম করতেন না।

চার.

হযরত জাম'আ (রহ.) সারা রাত্র নফল নামায আদায় করতেন। যখন প্রভাত হত তখন উচ্চ আওয়াজে একটি কবিতা পাঠ করতেন।

কবিতাটি হল—

يايهاالركب المعرسونا

اكل هذااليل ترقدونا

الاتقومون فترحلونا

ক্রন্দনরত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করা

আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আকাবেরগণ এত অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করতেন যে, তাদের চোখের পানি প্রবাহের স্থানে ক্ষত চিহ্ন হয়ে যেত। জাহান্নামের ভয়ে সারা রাত ক্রন্দন করতেন, এমনই একজন হলেন হযরত উমর ইবনুল মুনকাদের (রহ.)। সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় ক্রন্দন করতেন। তাঁর এই কষ্ট ও মুজাহাদা দেখে গর্ভধারিণী মা বলতেন, হায়! আমি যদি তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেতাম! মায়ের আকাঙ্ক্ষার উত্তরে এ বুযুর্গ বলতেন, হে আমার মা! আল্লাহর কসম, রাত্রি আসার সাথে সাথে আমার অন্তরে প্রবল ভয়ের সঞ্চার হয়। আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর তৈরি জাহান্নামের ভয়ে বেচাইন হয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ক্রোধ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করতে থাকি। এমতাবস্থায় কখন যে রাত্রি সমাপ্ত হয়ে যায় আমি বলতে পারব না। এতদসত্ত্বেও ইবাদত- প্রার্থনার মাধ্যমে আমার হাজত পুরা হয় না। অর্থাৎ এ বুযুর্গের অন্তরে এ পরিমাণ আল্লাহর ভীতি ছিল যে, সারা রাত্র ক্রন্দন করেও তাঁর চাহিদা পুরা হত না।

গরম স্থানে গিয়ে নামায আদায় করা

আল্লাহ তা'আলা দিবা-রাত্রি উভয়টিকেই বান্দার মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দিনকে বানিয়েছেন রিযিক আহরণের জন্য। এ সময়ে সূর্যের আলোতে বান্দা নির্দিষ্ট রিযিক হাসিলের জন্য মেহনত করবে। নিজ ও পরিবারবর্গের রিযিকের জন্য পরিশ্রম করবে এবং ছুটাছুটি করবে বিভিন্ন দিকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— 'আর আমি দিনকে করেছি জীবিকা উপার্জনের সময়।'

রাত্রিকে করেছেন অন্ধকার আচ্ছাদিত, নীরব-নিস্তব্ধ, কোলাহল মুক্ত— যা নিদ্রিত বান্দাদের জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রামে সহায়তা করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— 'আর আমি রাতকে করেছি আচ্ছাদন'। এটা হলো দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম যে, মানুষ দিনের বেলা হালাল রিযিক অন্বেষণ করবে, আর রাতের বেলা বিশ্রাম গ্রহণ করবে। কিন্তু দুনিয়ার বুকে এমন বহু আল্লাহপ্রেমিক অতিবাহিত হয়েছেন যারা সারা দিন পরিশ্রম করেও সারারাত মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে নফল আদায়ে দণ্ডায়মান থাকতেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত সাফওয়ান ইবনে সালীম (রাহ.)। হযরত সোলাইমান ইবনে সালীম (রহ.) এ বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, হযরত সাফওয়ান ইবনে সালীম (রহ.) রাত্রিবেলা ঘুম এসে যাওয়ার ভয়ে গরম স্থানে গিয়ে নামায আদায় করতেন, যাতে গরমে ঘুম আসতে না পারে। আর শীতের সময় বাইরে বা ছাদে গিয়ে নামায আদায় করতেন যাতে শীতের প্রচণ্ডতার কারণে ঘুম আসতে না পারে। এ বুযুর্গ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিছানায় শয়ন করেননি।

প্রত্যহ এক হাজার রাকা'আত নফল নামায আদায় করা

ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার এক স্বাভাবিক বিধান হলো, যাকে বেশি ভালবাসে সে তার নিকট অধীক গমন ও অবস্থানকে পছন্দ করে। দুনিয়ার জাগতিক বস্তুর আকর্ষণ এত অধিক যে, সমস্ত ব্যস্ততা পরিহার করে এমনকি মহান স্রষ্টা আহকামুল হাকিমীনের বিধানকে পর্যন্ত ভুলে যাওয়া হয়। তবে বহু আল্লাহওয়ালা এমন রয়েছে যারা নশ্বর এ ধরার সকল বস্তুর

উপর প্রভু প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই সর্বক্ষণ তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। প্রত্যহ হাজার হাজার রাকা'আত নামায আদায় করতেন, আবার দিনের বেলা লাগাতার রোযা রাখতেন। তাদের একজন হলেন হযরত মাস'আব ইবনে সাবেত (রহ.)। তৎকালীন সময়ের সর্বাধিক ইবাদতকারী। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মিসকীন (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি মাস'আব ইবনে সাবেত (রহ.)-এর চেয়ে অধিক রুকু ও সিজদাকারী দেখিনি। তিনি দিন রাত্রি এক হাজার রাকাত নামায আদায় করতেন এবং সর্বদা রোযা রাখতেন।

প্রত্যহ সাতশত রাকা'আত নফল নামায আদায় করা

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সকল শক্তির আধার। মানুষকে জীবন দান করেন। মৃত্যু দান করেন। এ বিশ্ব বসুন্ধরার তিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও রক্ষাকারী। তিনি আমাদের সমস্ত কিছু দেখছেন ও শোনছেন– এ বিশ্বাস রয়েছে সকল মুসলমানেরই, তবে বিশ্বাসের মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। কারো বিশ্বাস তাদের দুনিয়ার সকল কাজকে সঠিকভাবে পালন করে সময় মতো আল্লাহ তা'আলার আবশ্যকীয় বিধানাবলী পালন করছে। কারো বিশ্বাস আরার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পর্যন্ত স্থবির হয়ে যায়। তাঁরা চলাফেরা সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার হুজুরীকে উপলব্ধি করতে থাকেন, তাই সর্বদা জাগতিক এ জিন্দেগীর উপর আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাদের একজন হলেন হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ নাখরী (রহ.)। এ বুযুর্গ প্রত্যহ দিবা-রাত্রিতে সাতশত রাকা'আত নামায আদায় করতেন। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাহাজ্জুদের মাঝে অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করতেন।

প্রত্যহ চারশত রাকা'আত নফল নামায আদায় করা

দুনিয়াতে বন্ধুর উপহার অত্যন্ত প্রিয় হয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো আবার প্রিয়জনের মৃদু আঘাতও অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে। প্রেমিককে প্রেমিকা পরীক্ষামূলক যদি কোন কষ্ট দেয় তাও প্রেমিকের নিকট

অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়। ঠিক অনুরূপ যুগে যুগে দুনিয়ার বুকে এমন কিছু আল্লাহ প্রেমিকের আগমন হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন প্রকার মসিবত আসলে তাকে তাঁরা নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করত এবং মাহবুবের পক্ষ হতে পরীক্ষা হিসেবে হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। তাদেরই একজন হলেন আল্লামা ফতহে মুসনী (রহ.)। একদা তাঁর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হল। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আপনি আম্বিয়ায়ে কিরামদের মত আমাকেও পরীক্ষা নিচ্ছেন, এতে আমি শুকরিয়া আদায় করবো। আজ রাতে শুকরিয়া হিসাবে চারশত রাকাত নফল নামায আদায় করবো। এ বুযুর্গ অত্যধিক তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন যেদিন। অসুস্থ মনে হতো সে দিন আরো বেশি করে ইবাদত করতেন।

প্রত্যহ তিনশত রাকা'আত নফল নামায আদায় করা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এক প্রসিদ্ধ নাম। মাযহাবী চার ইমামের অন্যতম একজন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, গভীর জ্ঞান, আল্লাহর ভয়, তাকওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত ও রিয়াযতের তুলনা চলে না। বিশেষ করে ইসলামের জন্য দৃঢ়তা-অবিচলতা এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে বিনয়ী ও ভীরুতার নজীর মিলে না। তিনি ইলমী শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রত্যেহ দিবা-রাত্রি তিনশত রাকা'আত নামায আদায় করতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে কুরআন সংক্রান্ত মাসআলাকে কেন্দ্রকরে জালেম বাদশাহ, খলিফায়ে মুতাসিম বিল্লাহ কর্তৃক অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন, যা ইতিহাস খ্যাত। সে নির্যাতন ও বয়বৃদ্ধতার করণে যখন শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় তখনো তাহাজ্জুদ পরিহার করেননি। দিবা-রাত্রি দেড়শত রাকাআত নফল নামায আদায় করেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত দেড়শত রাকাআত করে নামায আদায় করেন। যার আধিকাংশই ছিল রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামায।

সারা রাত রুকু-সিজদায় অতিবাহিত করা

হযরত ওয়াসকরনী (রহ.) সকল মুসলমানের নিকট একটি প্রসিদ্ধ নাম। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসার নজীর স্থাপন করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। সন্ধ্যা হতেই অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যেতেন কি করে অতিবাহিত করছেন আজকের রজনী। চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে আসত। সংকল্প করতেন আজ রাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে রুকুতে অতিবাহিত করবোন সংকল্প অনুযায়ী সারা রাত্র রুকুর মাঝেই অতিবাহিত করতেন। আবার সংকল্প করতেন আজ রাত আল্লাহ তা'আলার জন্য সিজদায় অতিবাহিত করবো, সে রাত্রি সিজদায় অতিবাহিত করতেন। এভাবেই কাটাত এ মহামানবের রাত্রি। বছরের-পর বছর কোনদিন দণ্ডায়মান অবস্থায় তিলাওয়াতে, কোন দিন রুকুতে, কোন দিন সিজদায় আবার কোন দিন কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে কাটিয়ে দিতেন সারা রাত্রি।

পায়ের পেণ্ডুলী ফুলে যাওয়া

এক. দুনিয়ার মানুষ দুনিয়া হাসেলের জন্য কতই না মেহনত করে! ইউরোপ-আমেরিকার ভিসার জন্য কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পা ফুলিয়ে ফেলে। সেখানে সারা দিন দাঁড়িয়ে থেকে ইসলাম বিদ্বেষীদের খেদমত করে কিছু অর্থ উপর্জনকেই নিজের জীবনের সৌভাগ্য মনে করে, অথচ তারও জানা যে এ দুনিয়া নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তার দাদা চলে গেছে, বাবা চলে গেছে। ফিরে আসবে না কোনদিন, তারও যেতে হবে একদিন। সেও আর কোনদিন আসবে না। আর যে দিকে যাচ্ছে সেখানে দুনিয়ার এ অর্থ সম্পদ, অট্টালিকা কোনই কাজে আসবে না– এটাই চিরন্তন সত্য। সকলেই তা উপলব্ধি করে থাকে। তবে এ উপলব্ধির মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। কারো উপলব্ধি ক্ষণে ক্ষণে উদিত হয় আবার সামান্য সময় পরেই ভুলে যায়। বাবার জানাযায়, মায়ের জানাযায় গিয়ে উপলব্ধি হয়, পরক্ষণে দুনিয়ার পেছনে পড়ে ভুলে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এ জমিনে এমনও আল্লাহওয়ালা রয়েছেন যারা দুনিয়ার এ অর্থ-সম্পদের কোন পরোয়া করেন না। তারা প্রতিনিয়ত শুধু চিন্তা করেন পরপারের, অনন্ত

কালের পাথেয় সংগ্রহে সদা ব্যস্ত। জান্নাতের ভিসার জন্য তারা দাঁড়িয়ে থাকের প্রভুর দরবারে সারা রাত। পা ফুলিয়ে নামায আদায় করেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য। তাদের একজন হলেন আল্লামা মাসরুক (রহ.)। এ মহান বুযুর্গ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তিনি এত লম্বা সময় নামায আদায় করতেন যে, তার পায়ে পানি এসে যেত। হযরত মাসরুক (রহ.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী এত অধিক পরিমাণ নামায আদায় করতেন যে সর্বদা তাঁর পায়ের পেণ্ডুলী ফুলে থাকত। কোন এক হজ্জ মৌসুমে এ বুযুর্গ হজ্জব্রত আদায়ের লক্ষে বাইতুল্লাহর মেহমান হিসাবে গমন করেন। তথায় তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহ তা'আলার ঘরের সামনে সিজদারত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। পুরা সফরে সামান্য সময়ের জন্যও নিদ্রায় যাননি। বিনিদ্র অবস্থায় সেই দীর্ঘদিনের সফর সমাপ্ত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দুই. হযরত শোওবা (রহ.) অত্যন্ত বুযুর্গ খোদাভীরু বান্দা ছিলেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এত অধিক পরিমাণ নফল নামায আদায় করতেন যে তাঁর পা ফুলে যেত।

সওয়ারী অবস্থায় নফল আদায় করা

সময় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিয়ামতের দিন বান্দা যখন আমলের বিনিময় দেখতে পাবে তখন শুধু আফসোস করবে ঐ সময় টুকুর জন্য যে সময় তার থেকে কোন আমল ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। অনেক বুযুর্গ তার উপলব্ধি ও অনুভূতি দুনিয়াতেই করতে পারতেন। তাই তাদের সামান্য সময় ইবাদত ব্যতীত অতিবাহিত হলে দুনিয়াতেই তার ব্যথা অনুভব হতো এবং সর্বদা সময়ের হিসাব করে ইবাদত করতেন, যাতে আফসোস যা করার দুনিয়াতে করা হয়, কিয়ামতের দিন যাতে কোন প্রকার আফসোস করতে না হয়। এ জাতীয় আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে একজন হলেন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রহ.), যিনি সময়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। প্রতি সময় ইবাদতে অতিবাহিত করার জন্য ছিলেন সোচ্চর। সফর অবস্থায়ও ভুলে যাননি নিজের মামুলাত। হযরত মুসা ইবনে ইয়াসীর (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আমি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রহ.)-এর সোহবতে মক্কা থেকে বসরা পর্যন্ত সফর করি। আমি লক্ষ করেছি তিনি সারা রাত নফল নামায

আদায় করতেন, সওয়ারীর উপর আরোহণরত অবস্থায় বসে ইশারার দ্বারা নামায আদায় করতেন, আর কোথাও অবস্থান করলে সাথে সাথে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন, প্রভাতে সকলকে তিনি জাগিয়ে দিতেন।

মসজিদেই বিছনা করে অবস্থান করা

হযরত ফোযায়েল ইবনে আইয়াজ (রহ.) যিনি তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ ছিলেন। হারাম শরীফে অবস্থান করতেন, সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত্রি নামাযে লিপ্ত থাকতেন। মসজিদের এক পাশে একটি বিছানা করে রেখেছিলেন। রাতের প্রথম অংশ থেকেই নফল নামাযে দণ্ডায়মান হতেন। যখন অধিক পরিমাণ নিদ্রা আক্রমণ করত তখন তিনি সে বিছানায় যেতেন। সামান্য সময় আরাম করে আবার নামাযে দণ্ডায়মান হতেন। ঘুম প্রকট আকার ধারণ করলে সামান্য সময় আরাম করে পুনরায় নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে সকাল পর্যন্ত একই আমলে লিপ্ত থাকতেন।

রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করা

ইমাম শাফী (রহ.) মাযহাবে আরবার প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর উপর যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কুরআন-হাদীসের জ্ঞান সমূদ্র থেকে চয়ন করা মণি-মুক্তা উপকার উপভোগ করছে এখনো লক্ষ-কোটি আশরাফুল মাখলুকাত। ইলমি দক্ষতার পাশাপাশি তিনি ছিলন একজন মুত্তাকী-পরহেযগার, খোদাভীরু-আল্লাহ ওয়ালা। তিনি সারা জীবনের জন্য রাত্রিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম ভাগে উম্মতের ফায়দার জন্য কুরআন হাদীস থেকে চয়নকৃত মণি-মুক্তাগুলো লিখে যাওয়ার কাজ করতেন। দ্বিতীয় ভাগে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অবনত মস্তকে সিজদায় লুটে পড়তেন, আদায় করতে শত রাকা'আত তাহাজ্জুদের নামায। আর তৃতীয় ভাগে তথা রাতের শেষ অংশে সামান্য সময় আরাম করতেন।

রাবীয়া ইবনে সোইযান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি ইমাম শাফী (রহ.)-এর খেদমতে রাত্রি যাপন করেছি। রাত্রির শেষ ভাগে খুব স্বল্প সময়ই তাকে বিশ্রাম করতে দেখেছি।

জাহান্নামের স্মরণে ঘুম উড়ে যাওয়া

এক.

জাহান্নাম এক ভায়াবহ পরিণতি, যার কঠোর শাস্তি ও নিকৃষ্ট অবস্থার বর্ণনা কক্ষণো সম্ভব নয়। শুধু বলা যেতে পারে যে, সেখানে কোন শীতলতার চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। সর্বক্ষণ অবর্ণনীয় অগ্নিদগ্ধ হতে থাকবে। পান করার জন্য কোন পানীয় পাবে না। শুধু ফুটন্ত পুঁজ পরিবেশন করা হবে, যা মুখের কাছে আনার সাথে সাথে চেহারা ভুনা হয়ে যাবে এবং পেটে প্রবেশের সাথে সাথে পেটের ভিতরের সমস্ত কিছু খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে। এ বর্ণনা জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখে করার দ্বারা তাকে জান্নাতই মনে হবে তাই বলতে হবে। জাহান্নামের ভয়াবহ পরিণতি বলে বুঝাবার নয়। আমাদের বলা ও বুঝার ভয়াবহতা যে স্থানে সমাপ্ত হবে তার বহু পর থেকে হয়তো জাহান্নামে শাস্তির সূচনা হবে। তাই এ অনুভূতি যাদের মাঝে সামান্যও এসেছে, তারা কস্মীনকলেও সারা রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করতে পরেন নি। হযরত তাওস ইবনে কায়সান (রহ.) তাদের একজন। জাহান্নামের ভয়ে নিদ্রা যেত উড়ে। এ বুযুর্গ কখনো রাতে আরাম করতে বিছানায় গেলে জাহান্নামের স্মরণ তাকে এমনভাবে পেরেশান করত যে তিনি বিছানার মাঝে ছটফট শুরু করতেন এবং সামান্য সময়ও শুয়ে থাকতে পারতেন না, সাথে সাথে লাফিয়ে উঠতেন এবং নামাযে দণ্ডায়মান হতেন। সারা রাত্রি ক্রন্দনরত অবস্থায় ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যেত।

দুই.

হযরত সোহাইব আবেদ (রহ.)-একজন মহিলার গোলাম ছিলেন। তিনি সারা রাত্রি ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর মনিব একদা ডেকে বলল, তোমার রাত্রি জাগরণের কারণে দিনের বেলা কাজের ক্ষতি হয়। তিনি উত্তর করলেন, আমি কি করবো? রাতেরবেলা যখন জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের কথা স্মরণ হয় তখন আমার ঘুম উড়ে যায়।

সর্বাধিক প্রিয় আমল

জগৎ বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী (রহ.) ইরশাদ করেন, আমার নিকট রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করার সামান্য কষ্ট ও আল্লাহ তা'আলার রাহে অর্থ ব্যয়ের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন আমল নেই। এ দু'টি আমল আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

জান্নাতের বিছানা অধিক নরম

এক.

হযরত আব্দুল আজীজ ইবনে ওসমান (রহ.) রাতে শোয়ার সময় বিছানায় হাত রেখে বলতেন, হে বিছানা! তুমি অত্যধিক নরম, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কসম! জান্নাতের বিছানা তোমার চেয়েও অধিক নরম। একথা বলেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সারা রাত জান্নাতের নরম বিছানায় ঘুমানোর প্রত্যাশা নিয়ে নামাযেই কাটিয়ে দিতেন।

দুই.

কোন এক আল্লাহর ওলী সফর অবস্থায় আরামের জন্য বিছানায় গেলেন এবং অধিক পরিশ্রমের কারণে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় রাখতেই নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমের ঘরে ঢলে পড়লেন। বুযুর্গের নিয়মিত রাত্রের আমল ছুটে গেল। যার কারণে তিনি প্রভাতে এতই অনুতপ্ত হন যে, কসম করে ফেলেন, কোন দিন আর বিছানাতেই পিঠ লাগাবেন না। একবারে জান্নাতের বিছানায় গিয়ে আরাম করবেন।

জান্নাতের পরিচয়

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত কিসের তৈরী? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তার একটি ইট স্বর্ণ আর অন্য ইট রৌপ্যের। তার গাঁথুনি সুগন্ধময় মেশকের, সুরকী মারওয়ারিদ ও ইয়াকুত পাথরের এবং তাতে থাকবে সুগন্ধময় জাফরান। জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে চিরকাল থাকবে। জ্বরা-মৃত্যু, রোগ ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্ট জান্নাতীকে

কস্মীনকালেও স্পর্শ করবে না। সেখানে জান্নাতী কখনো বিপদ-আপদের আছর দেখবে না, শুধু সুখময় জীবন যাপন করবে। তাঁর পরিহিত পোশাক-আশাক কখনো পুরাতন ও ধূলিমলিন হবে না, এমনকি তাঁর যৌবনে কোন প্রকার দুর্বলতা ও ভাটা আসবে না। চিরকাল পূর্ণ যৌবনে অতিবাহিত করবে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রত্যাশা

হযরত সোলাহা ইবনে আসীম (রহ.) সারা রাত ইবাদত করতেন, প্রত্যুষে এ দু'আ করতেন–

الـــهيليس مثلييطلب الجنةولكن اجرنـــيبرحـــمتك من النار

'হে আল্লাহ! আমি তোমার উপযুক্ত নই যে তোমার কাছে জান্নাতের আবেদন করব। তবে তুমি নিজের মেহেরবানীতে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান কর।'

সারা রাত্রি ইবাদতে কাটিয়ে এ মহান ব্যক্তিত্ব দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের আবেদন করার উপযুক্ত নই। অথচ আমরা যারা সারা রাত ঘুমিয়ে কাটাই আমাদের কি প্রত্যাশা! তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার এসকল ওলীদের বিনয় কত ঊর্ধ্বের যা কল্পনাই করা যায় না।

তাহাজ্জুদ দোযখের আগুনকে নির্বাপিত করে

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) কোন এক রাত্রিতে বাইতুল মাকদাসের অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি শুনতে পেলেন, বাইতুল মাকদাসের গুম্বুজ থেকে কেউ যেন উচ্চ আওয়াজে বলছে, হে ইব্রাহীম! তাহাজ্জুদ পড়ার ক্ষেত্রে অলসতা করো না। কেননা তাহাজ্জুদের নামায দোযখের আগুনকে নির্বাপিত করে এবং পুলসিরাতে কঠিন মুহূর্তে তার পাকে অটুট-অবিচল রাখে। এ আওয়াজ শ্রবণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনদিন এ মহামানব তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ করেন নি।

পরিবারের সদস্যকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করা

এক.

হযরত মুগীরা (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রহ.)-এর গৃহে এক মাস অবস্থান করেছিলাম। তখন তাকে কোন রাত্রিতেই নিদ্রা যেতে দেখিনি। উপরন্তু গৃহবাসীকে বলতেন– انتبهوا فماهذه دارنوم অর্থাৎ তোমরা জাগ্রত হয়ে যাও, কেননা এটা ঘুমের ঘর নয়।

দুই.

হযরত সাবেত নাবানী (রহ.) সারা রাত্র তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং পরিবারের সদ্যদের বলতেন– উঠ নামায পড়। নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়া কিয়ামতে ভয়াবহ অবস্থা ও ভয়ংকর অবস্থা থেকে অনেক সহজ।

বাঁদীর পরহেযগারী

হযরত হাসান ইবনে সালেহ (রহ.)-এর এক বাঁদী ছিল। একদা কোন এক কারণে তিনি সে বাঁদীটিকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিলেন। লোকটি বাঁদীকে নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে গেল। বাঁদী নতুন মনিবের বাড়িতে গিয়ে রাতে জাগ্রত হলেন এবং মনিবকে লক্ষ করে বললেন, হে ঘরওয়ালা! উঠ, নামায আদায় করো। বাড়ির মালিক বাঁদীটিকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার! এখনই কি সকাল হয়ে গেছে? ফজরের তো এখনো বহু বাকী।

মনিবের কথা শুনে বাঁদী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি ফরয ব্যতীত অন্য কোন নামায আদায় করেন না? মনিব বলল, হ্যাঁ। আমি ফরয ব্যতীত সুন্নত ও ওয়াজিব নামায আদায় করি। তবে নফল ও তাহাজ্জুদ আদায় করি না। বাঁদী সকাল বেলাই অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে হযরত হাসান ইবনে সালেহ (রহ.)-এর খিদমতে এসে আরয করলেন, হে আমার মনিব! আপনি আমাকে এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করেছেন, যিনি সারা রাত্র ঘুমিয়ে কাটায়। আমার আশংকা হচ্ছে যে, না জানি তার এ বিলাসিতা দেখে আমার হিম্মতে কমতি চলে আসে। অতএব, আপনার নিকট আমার

বিনীত অনুরোধ, আপনি আমাকে তার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। অতঃপর হযরত হাসান ইবনে সালেহ তার অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং তাকে ঐ লোক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন।

তাহাজ্জুদ হূরের মহর

এক.

হযরত আযহার ইবনে মুগীছ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি একদা স্বপ্নে এমন এক সুন্দরী নারীকে দেখলাম যার তুলনা দুনিয়াতে হতে পারে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? সে উত্তর করল, আমি হূর। আমি তাকে বললাম, তুমি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। সে বলল, তুমি আমার বিবাহের প্রস্তাব আমার মনিবের কাছে দাও এবং আমার জন্য মহর সংগ্রহ করো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মহর কি? উত্তরে সে বলল, দীর্ঘ তাহাজ্জুদ। অর্থাৎ রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ আদায় করাই হলো আমার মহর। তুমি দুনিয়াতে থাকতেই তা সংগ্রহ করো, তবেই আখেরাতে আমাকে বিয়ে করতে পারবে।

দুই.

হযরত মালেক ইবনে দিনার (রহ.) বর্ণনা করেন, একদা এক রজনীতে আমি আমার নিয়মিত সমস্ত অযীফা পরিহার করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ইত্যবসরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক অত্যন্ত সুন্দরী-রূপবতী, যুবতী আমার সামনে দণ্ডায়মান। তার হাতে ছোট একটি কাগজের টুকরায় কি যেন লেখা রয়েছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হে মালেক ইবনে দিনার! তুমি কি এ লিখিত বস্তুটি ভালভাবে পড়তে পারবে? আমি বললাম, হ্যাঁ! সে ঐ টুকরাটি আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল–

الـــهتك اللذائذوالاهانى عن البيض الانس فى الجنان

পড়েছ কি তুমি জাগতিক
এ ভোগ-বিলাসের তরে,
ভুলেছ কি তুমি জান্নাতী
যে পূতঃপবিত্রা হূরদের?

تعش مخلدالاموت فيها وتل هوفى الجنان مع الحسان

অনন্ত-অসীম জীবন সেথা পাবে
অশুভ মৃত্যুর ছোঁয়া হেথা নাহি রবে,
সুন্দরী-রূপসী অসংখ্য নারী তাতে হবে
উচ্ছ্বাস-উপভোগের হিসাব নাহি হবে।

تنبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقران

নিদ্রা দূরে ফেলে উঠ তাহাজ্জুদে
কুরআন পড় সদা মঙ্গল এতে।

তিন.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) সারা রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। একদা তার স্ত্রী অনুরোধ করল যে, আজ রাতে সামান্য সময় বিশ্রাম করে নিন। এ বুযুর্গ স্ত্রীর অনুরোধে ঘুমিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, এক বিশাল দেহের অধিকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট আসল এবং মাথার অগ্রভাগের চুল ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, হে গাফেল! নামায আদায় করো। নিজ প্রতিপালকের অংশকে বিনষ্ট করো না। নিজ স্ত্রীর জন্য অন্যদের হক পরিত্যাগ করো না। এ দৃশ্য দেখে বুযুর্গ ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাত নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছেন।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রত্যাশা

এক.

হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ মুনকাদরী (রহ.) প্রত্যেহ দিনে রোযা রাখতেন, আর রাতে বেলা অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে ক্ষিণ আওয়াজে বলতে থাকতেন, 'নিরব-নিস্তব্দ রজনী! অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। সমস্ত আশেক তার মাহবুবের কাছে পৌঁছে গেছে। হে আল্লাহ! এ সময় আপনার সাথে আমার একাগ্রতা অত্যন্ত প্রিয়। হায়! যদি আমার দোযখ থেকে আশ্রয় মিলত, হায়!! যদি আমার দোযখ থেকে আশ্রয় মিলত।

দুই.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) সারা রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। দিনের বেলা একদিন রোযা রাখতেন এবং অন্য আরেক দিন ইফতার করতেন। সর্বক্ষণ জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করতেন।

তাহাজ্জুদে কুরআন খতম করা

এক.

আহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ও সোহান ইবনে আ'তা (রহ.) প্রত্যেহ দিবা-রাত্রি তিন খতম করে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

দুই.

হযরত সাঈদ ইবনে ইব্রাহীম (রহ.) প্রতিদিন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

তিন.

হযরত ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মানসুর (রহ.) প্রত্যেহ দিবা-রাত্রি মিলে এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

চার.

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রহ.) প্রত্যেক দিন পবিত্র কালামে পাকের এক চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করতেন এবং সমস্ত রাত্রি নামাযে অতিবাহিত করতেন।

পাঁচ.

ওয়াকী ইবনে জারীর (রহ.) প্রত্যেহ রাত্রে এক খতম করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এ বুযুর্গ একদা কিছু দিনের জন্য আবীদিন নামক এক শহরে অবস্থান করেছিলেন। তথায় তিনি চল্লিশ খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন এবং চল্লিশ হাজার দিরহাম সদকা করেছেন।

আয়াত পাঠরত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করা

এক.

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) কোন এক রাতে একটি আয়াত পড়ে রাত কাটিয়ে দিলেন। আয়াতটি হল–

ام حب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوادعملوا الصلحت

দুই.

হযরত তামীমে দারামী (রহ.)ও একদা –ام حب الذين এ আয়াত পাঠ করতে করতে রাত অতিবাহিত করে দেন।

আবদীস সালেহ উপাধি লাভ করা

হযরত মুসা ইবনে জা'আফর (রহ.) রাত্রিকালীন সময় অধিক পরিমাণ নামায আদায় করতেন। অধিক ইবাদতের কারণে তার উপাধি 'আবদীস সালেহ' হয়ে গিয়েছিল।

রাত্রি জাগরণের উপকরণ

আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রাত্রি জাগরণের উপকরণসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

এক. জাহেরী– 'প্রকাশ্য' উপকরণ।

দুই. বাতেনী– 'গোপনীয়' উপকরণ।

প্রকাশ্য উপকরণ চার প্রকার

এক.

আহার কম করা। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) রাত্রি জাগরণের প্রকাশ্য উপকরণসমূহের মাঝে সর্বপ্রথম উপকরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন কম আহার করা। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, অধিক আহারের কারণে অধিক পিপাসার চাহিদা হয়। তার থেকে সৃষ্টি হয় অলসতা, যা রাত্রি জাগরণের প্রকাশ্য শত্রু।

কিছু সংখ্যক বুযুর্গের অভ্যাস ছিল তারা তাদের মুরিদগণের দস্তরখানে গিয়ে বলতেন–

يامعاشرالمريدين لاتاكلوا اكثيرا فتشربو اكثيرا فترقدوا اكثيرا فتحرواغدالموت كثيرا

হে মুরিদগণ! তোমরা অধিক আহার করবে না। কেননা তা অধিক পিপসার সৃষ্টি করে। অধিক পানি পান করার দ্বারা ঘুম অধিক হয়, যার ফলে ইবাদত করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণে মৃত্যুকালে অধিক আফসোস করতে হবে।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহ.) বর্ণনা করেন, কোন এক রাতের ঘটনা। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) প্রবল ঘুমে বিভোর হয়ে গেলেন। রাতের নির্ধারিত ইবাদত ছুটে যায়। কারণ ছিল সে দিন হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পেটভূরে রুটি ভক্ষণ করেছিলেন। তাঁর এ গাফলতি সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করলেন, হে ইয়াহইয়া! যদি তুমি জান্নাতুল ফিরদাউসকে একবার দেখতে তবে তার মুহাব্বতে নিজের শরীরকে বিলীন করে দিতে এবং চোখের পানি এ পরিমাণ প্রবাহিত হত যে, তা শুকিয়ে রক্ত প্রবাহিত হত। কাপড়ের পরিবর্তে শরীরে লোহার পোশাক পরিধান করতে। অর্থাৎ যে কোন কঠিন মসিবতকে সহজভাবে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে। তাকে না দেখার কারণে আজ অলস নিদ্রায় বিবোড় হয়ে যাচ্ছ।

দুই.

দিনের বেলা অধিক কঠিন ও পরিশ্রমী কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা। কেননা অধিক পরিশ্রমের কারণে ঘুমের প্রকটতা বেড়ে যায়।

তিন.

দিনের বেলা কায়লুলা পরিত্যাগ করবে না। কেননা কায়লুলা রাত্রিজাগরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। হযরত মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) জানতে পারলেন তাঁর কোন এক অধীনস্ত দিনের বেলা কায়লুলা করে না। হযরত ওমর (রা.) তাকে লক্ষ করে এ ভাষায় পত্র লিখলেন–

امابعدفقل فان الشيطان لايقيل

হামদ ও সালাতের পর, কায়লুলা করো। কেননা শয়তান কায়লুলা করে না।

চার.

গুনাহ ও অপরাধ মুলক কাজ থেকে বিরত থাক। কেননা এটাও রাত্রি জাগরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। মানুষ যখন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তখন তার অন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ময়লার সৃষ্টি হয়। অন্তরের অন্ধকার আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরত্বের সৃষ্টি করে। কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর খেদমতে এসে আরয করলেন, আমি রাত্রকে অত্যন্ত সুস্থতার সাথে অতিবাহিত করি এবং রাত্রি জেগে ইবাদত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কিন্তু অলসতা ইচ্ছার উপর বিষয় হয়ে যায়, রাত্রিজাগরণ করতে পারি না। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, তোমার গুনাহ তোমাকে তাহাজ্জুদ থেকে বিরত রাখে। ইমাম সুফয়ীনে সাওরী (রহ.) বলেন, একটি গুনাহের কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত করা হল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ঐ গুনাহ কি? তিনি উত্তর করলেন, আমি কোন এক ক্রন্দনকারীকে বলতে শুনেছি, তা হল রিয়া। ইমাম গাজালী (রহ.) বর্ণনা করেন, সমস্ত গুনাহ অন্তরে ময়লা সৃষ্টি করে এবং তা তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। বিশেষ করে হারাম খাদ্য অন্তরে অধিক প্রভাব ফেলে, যেমনিভাবে হালাল খাবার অন্তরে স্বচ্ছতা তৈরী করে। হারাম আহার অন্তরকে অন্ধকার করে তুলে এবং তাহাজ্জুদ থেকে বিরত রাখে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির তাহাজ্জুদ কাজা হল বুঝতে হবে অবশ্যই এটা কোন না কোন গুনাহের সাজা যা সে ইতিপূর্বে করেছে।

অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নিজের অন্তরের সাথে বুঝাপরা করতে হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে, আজ তোমার দ্বারা কি পরিমাণ গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। যে পরিমাণ গুনাহ হয়েছে তার থেকে তাওবা ইস্তিগফার করো যাতে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক লাভ হয়। তিনি বলেন, রাত্রি জাগরণ তার জন্য অসম্ভব হয়ে যায় যার কাঁধে গুনাহের বোজা থাকে। কোন এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর

খিদমতে আরয করলেন, আমি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে পারি না। আপনি আমাকে এমন কিছু ঔষধ বলে দিন যার দ্বারা আমার জন্য তাহাজ্জুদ পড়া সহজ হয়ে যাবে। উত্তরে ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বলেন, দিনের বেলা গুনাহ করা ছেড়ে দিবে। তার বদৌলতে আল্লাহ সুবহানহু তা'আলা তোমাকে রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক দিবেন। তার হিকমত হল, রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ পড়া অত্যন্ত সম্মান-ইজ্জতের ব্যাপার। আর নাফরমান গুনাহগারকে এ সম্মান ও ইজ্জত প্রদান করা হয় না।

গোপনীয় উপকরণ

রাত্রি জাগরণের বাতিনী উপকরণসমূহও চার প্রকার-

এক.

অন্তরকে কীনা, বিদ'আত, দুনিয়ার মুহাব্বত ও ভোগ-বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াদারীর মাঝে নিমজ্জিত থাকে তার দ্বারা তাহাজ্জুদ সম্ভব হয় না।

দুই.

আখেরাত ভীতি জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য মুমিনের নিদ্রাকে প্রতিহত করে। হযরত তাউস (রহ.) বর্ণনা করেন, জাহান্নামের স্মরণ আবেদদের নিদ্রাকে দূরীভূত করে। কোন এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি সারা রাত্রি জাগ্রত থাকেন কি করে? তিনি ইরশাদ করলেন, আমি যখন জাহান্নামের কথা স্মরণ করি তখন আমার অন্তরে প্রচণ্ড ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং যখন জান্নাতের কথা স্মরণ করি তখন অন্তরে অধিক পরিমাণ আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় আমার থেকে নিদ্রাকে বহু দূরে সরিয়ে দেয়।

তিন.

আয়াত, হাদীস ও আছারের মানে তাহাজ্জুদের যে সকল ফযিলত ও সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা নিয়ে অধিক পরিমাণ চিন্তা করা। এ সমস্ত বিনিময় ও সাওয়াব লাভের প্রবল প্রত্যাশা অন্তরে পোষণ করা।

চার.

অন্তরে দৃঢ়ভাবে এ কথার বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, এ নামাযের মাঝে যে কুরআন তিলাওয়াত করছি তা মূলত আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলা ও তাঁর নিকট দু'আ প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ খবর রাখেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাযে এ দু'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ লক্ষ নেকী প্রদান করবেন। দু'আটি হল–

سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

তিনি পবিত্র, সমস্ত পশংসার একমাত্র উপযুক্ত। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই পক্ষ হতে প্রদত্ত্ব।

তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে এ দু'আ পাঠ করার দু'টি হিকমত উল্লেখ করেন।

এক.

শয়তানের সকল প্রকার প্রভাব ও আছর থেকে মুক্তি লাভ। কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় বনী আদমের অচেতন দেহে শয়তান রাজত্ব করতে থাকে।

দুই.

মুমিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয়।

তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করা

তাহাজ্জুদের আদবসমূহের মাঝে একটি আদব হল, যখন বান্দা তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হবে তখন ভালভাবে মিসওয়াক করবে। হযরত হুজায়ফা (রা.)-থেকে বর্ণিত–

عن حزيفة قال كان رسول الله اذاقام من الليل يشوص فاه بالسواك

হযরত হুজায়ফা (রা.) ইরশাদ করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রাত্রিকালীন সময় তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতে তখন মিসওয়াকের মাধ্যমে মুখ পরিস্কার করতেন।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার সময় নিজের মাথার কাছে মিসওয়াক রাখতেন। তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে প্রথমে মিসওয়া দ্বারা মুখ পরিস্কার করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত যাবের, হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তাহাজ্জুদের জন্য সুগন্ধী লাগানো এবং উত্তম কাপড় পরিধান করা

তাহাজ্জুদের জন্য সুগন্ধী ব্যবহার করা এবং নিজের উত্তম কাপড় ব্যবহার করা চাই। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে মিসওয়াক করে অযু করতেন। অতঃপর সুগন্ধী চাইতেন।

হযরত তামীমে দারামী (রহ.) যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন গালীয়া (তৎকালীন সময়ের সর্ব উৎকৃষ্ট সুগন্ধী) ব্যবহার করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন সুগন্ধী ব্যবহার করতেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেন–

كانوا يكرهون اكل الثوم والكراث البصل من الليل و كانوا ايستحبون ان يمس الرجل عندقيامه من الليل طيبايمسح به شاربيه وماقبل من اللحية

আকাবেরগণ রাত্রিকালীন সময় পিয়াজ বা দুর্গন্ধ জাতীয় খাবার ভক্ষণ করাকে অপছন্দ করতেন এবং তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পূর্বে সুগন্ধী ব্যবহার করতেন এবং নিজেদের মুছ ও দাড়িতে সুগন্ধী লাগানোকে মুস্তাহাব মনে করতেন।

হযরত মুগীরা ইবনে হাকেম (রহ.) যখন তাহাজ্জুদের জন্য দণ্ডায়মান হতেন তখন উত্তম কাপড় পরিধান করতেন এবং পরিবারের সবাইকে সুগন্ধী লাগিয়ে দিতেন।

নামায শুরুর পূর্বে কোন দু'আ পাঠ করা

তাহাজ্জুদ নামায শুরু করার পূর্বে মুসাল্লার উপর দণ্ডায়মান হয়ে অত্যন্ত খুশু-খুযুর সাথে দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করা হবে। দু'আটি পড়ে নামায শুরু করা হবে। দু'আয়ে মাছুরা বহু রয়েছে। এখানে উপমা হিসাবে দুটি উল্লেখ করছি–

اللهم لك الحمدانت قيام السموت والارض من فيهن ولك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد انت رب السموت والارض ومن فهن انت حق وقولك حق ووعدك حق ولقاوك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك بسلمت ربك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت انت ربنا واليك المصير رب اغفرلى مااعلنت وماقدمت ومااخرت انت الله لااله الاالله الاانت

হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আসমান-জমিন ও এ উভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সকল কিছুর শ্রষ্টা ও রক্ষাকারী। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমিই আসমান-জমিনকে আলোকিতকারী এবং আসমান-জমিন ও উভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুর পালনকর্তা। হে আল্লাহ! তুমি সত্য, তোমার কথা সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার আনুগত্যের জন্য মাথা নত করছি এবং আমি তোমার উপর ঈমান আনয়ন করছি। তোমার উপর ভরসা করি এবং আমি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। তোমার শক্তি দ্বারা আমি দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করি। তোমাকেই কেবল হাকিম মনে করি। তুমি আমাদের

প্রতিপালক, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন-প্রকাশ্য এবং অগ্র-পশ্চাৎে সমস্ত গুনাহ মা'ফ করে দাও। তুমিই মা'বুদ। তোমাকে ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।

এ দু'আ তাকবিরে তাহরীমার পরেও পড়া যাবে। কোন কোন বর্ণনা মতে রুকু থেকে উঠে ক্বওমা অবস্থায় এ দু'আ পাঠ করা উত্তম।

اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطرالسموت والارض عالم الغيت والشهادة انت تحكم بين عبادك فيماكانوافيه يختلفون اهدنى هما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

হে জিব্রাইল, ইস্রাফীল ও মিকাইলের প্রতিপালক! আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। বান্দার সমস্ত বিভেদ সমাধানকারী! হে আল্লাহ! আপনি কুদরতী হুকুম দ্বারা আমাকে সত্যের পথে পরিচালিত করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে চান সঠিক পথের সন্ধান দান করেন।

তাহাজ্জুদে কুরআন তিলাওয়াত

এক.

তাহাজ্জুদের মাঝে কুরআন শরীফকে অত্যন্ত তারতিলের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ورتل القران ترتيلا

কুরআনে পাক তারতিলের সাথে তিলাওয়াত করো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন, শব্দ শব্দ সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা এবং অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করা।

দুই.

উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআনের কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন তা অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করতেন। তাকে কুরআনে পাকে লিপিবদ্ধ সূরার চেয়েও অধিক লম্বা মনে হত।

তিন.

হযরত আলকামা (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সামনে কালামে পাক তিলাওয়াত করছিলেন, তাতে তিনি সামান্য তাড়াতাড়ি করছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, তারতিলের সাথে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করো। কেননা তারতিল হলো কুরআন শরীফের সৌন্দর্য।

উচ্চ আওয়াজে বা আস্তে তিলাওয়াত সম্পর্কে

তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন শরীফ উচ্চ আওয়াজে বা নিম্ন আওয়াজে উভয় অবস্থাতেই পড়ার অনুমতি রয়েছে। উভয় অবস্থায় পড়ার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা প্রকাশ্যে সদকা করার ন্যায়, আর নিম্ন স্বরে তিলাওয়াত করা গোপনে সদকা করার ন্যায়। সাহাবায়ে কিরামের আমলের মাঝে এ উভয় অবস্থাই পাওয়া যায়। এ সুবাদে বর্তমানেও উভয় অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা যাবে। তবে হ্যাঁ! লক্ষ রাখতে হবে, তার দ্বারা যেন কারো ঘুম বা অন্য কোন আমলের ক্ষতি সাধন না হয়।

রহমত ও আযাবের আয়াতে দু'আ করা

রহমত ও আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় তিলাওয়াত বন্ধ করে রহমতের প্রত্যাশী ও আযাব থেকে মুক্তির দু'আ করা যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন قل اعوذ برب الفلق পাঠ করবে তখন সাথে সাথে اعوذ برب الفلق আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি পড়বে। আর যখন قل اعوذ برب الناس তিলাওয়াত করবে তখন বলবে- اعوذ برب الناس আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি ভয় বা উৎসাহের আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন ভয়ের সময় আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং উৎসাহের সময় রহমত প্রত্যাশা করতেন।

তাহাজ্জুদের সময় ক্রন্দন করা

এক.

তাহাজ্জুদ আদায় করার সময় সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুহতাজ করা। তাহাজ্জুদের মাঝে ক্রন্দন করাও তার একটি আদব। হযরত মুতরিফ (রহ.) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ আল শাখীর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দেখেছি– তাঁর বুকের ভিতর থেকে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ক্রন্দন আওয়াজ বেরিয়ে আসত।

দুই.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-সহ বহু সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে তিলায়াতের সময় ক্রন্দন করার বর্ণনা প্রসিদ্ধ রয়েছে।

তিন.

হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রহ.) এত অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করেছেন যে, তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল।

রাতে শোয়ার সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করা

রাতে শোয়ার সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে শোয়া। কেননা যদি ঘুমের প্রকটতার কারণে জাগ্রত নাও হওয়া যায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার নিয়তের বদলা হিসাবে পুরা তাহাজ্জুদের সওয়াব প্রদান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেন, ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নিয়তে বিছানায় গেল। অতঃপর ঘুমের

প্রচণ্ডতার কারণে জাগ্রত হতে পারল না। এমতাবস্থায় সকাল হয়ে গেল। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিয়তের সওয়াব প্রদান করবেন এবং নিয়তের কারণে তার ঘুমটা সদকা হয়ে যাবে।

তাহাজ্জুদের আদবসমূহ

তাহাজ্জুদের আদবসমূহের মধ্য হতে বিশেষ বিশেষ আদব বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করছি।

১. তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার পর সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে। সে যিকির চাই তিলাওয়াত হোক বা অন্য কোন যিকির হোক।

২. তাহাজ্জুদের জন্য অযুর পূর্বে মিসওয়াক করা।

৩. কারো কারো মতে জাহাজ্জুদের জন্য রাতে জাগ্রত হয়ে গোসল করা।

৪. তাহাজ্জুদের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং ভাল কাপড় পরিধান করা।

৫. উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার পর কিবলামুখী হয়ে বিনম্রভাবে নামাযে দাঁড়াবে এবং হাদীসে বর্ণিত কোন দু'আ দ্বারা তাহাজ্জুদ শুরু করবে।

৬. তাহাজ্জুদ নামাযে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা দীর্ঘ করা উচিত।

৭. প্রতি দু'রাকাতের পর একশতবার তাসবীহ পাঠ করাও মুস্তাহাব। এতে একদিকে বিশ্রাম হয়, অপরদিকে পরবর্তীতে নামাযের জন্য উদ্যম সৃষ্টি হয়।

৮. কুরআন শরীফ তারতীলের সাথে (ধীরে ধীরে) তিলাওয়াত করা।

৯. তিলাওয়াত উচ্চৈঃস্বরে বা ক্ষীণ স্বরে উভয় রকমই জায়েয।

১০. রহমত বা আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় একটু থেমে দু'আ করা।

১১. তাহাজ্জুদ পড়ার সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ধ্যান থাকা এবং কান্নাকাটি করা উচিত।

১২. রাতে নামায পড়তে পড়তে যখন নিদ্রা আসবে ঘুমিয়ে পরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নামায পড়তে পড়তে নিদ্রা আসলে ঘুমিয়ে পড়া উচিত। কারণ এমতাবস্থায় না ঘুমালে দু'আর পরিবর্তে মুখ থেকে বদদু'আও বের হয়ে আসতে পারে।

১৩. রাতে তাহাজ্জুদের নামায ছুটে গেলে দিনে তা আদায় করে নেয়ার অনুমতি রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কোন কারণবশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাহাজ্জুদ নামায ছুটে গেলে দিনে বার রাকাত নামায আদায় করে নিতেন।

১৪. রাতে শোয়ার সময় তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার নিয়ত করে শুয়া। তাহলে জাগতে না পারলেও নিয়তের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদের সওয়াব দান করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার নিয়ত করে যদি কেউ শুয়ে পড়ে আর জাগ্রত হতে না পারে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়তের সওয়াব দান করেন।

১৫. রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে যার পূর্ণ ভরসা হয়, তার জন্য বিতরের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়া সুন্নত।

পরিশিষ্ট

এ বইটির পরিশিষ্টে উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ মহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর প্রদত্ত অসংখ্য মহামূল্যবান মাওয়ায়েজ থেকে একটি আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভের উপায় শিরোনামে উর্দু ভাষায় প্রকাশ হয়েছে বহুকাল পূর্বে। তাতে বর্ণিত উপায়সমূহের মাঝে একটি উপায় 'তাহাজ্জুদ' রয়েছে বিধায় পূর্ণ বয়ানটি এখানে তুলে দিলাম। এটুকু বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমার কোন প্রকার কৃতিত্ব বা অবদান নেই। বুযুর্গের এ বয়ানের সাথে যেন আমি অধমের লেখাগুলো কবুল হয়ে যায়, এর দ্বারা বইটির পরিপূর্ণতা আসে এবং পাঠক-পাঠিকাদের অধিক উপকার হয়।

আল্লাহর মহব্বত লাভের উপায়

وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَـٰهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ✡ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَـٰمًا ✡ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ✡ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে ধীর পদে (বিনম্রভাবে) চলে এবং যখন তাদের অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম তোমায়।

আর যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে সিজদারত হয়ে এবং দণ্ডায়মান অবস্থায়।

আর যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে সরিয়ে রাখ।

নিশ্চয়ই তা আশ্রয়স্থল এবং বসতি হিসেবে অত্যন্ত জঘন্য।

-সূরা ফুরকান- ৬৩-৬৬

এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, কি করে আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হওয়া যায়? খাস বান্দা হওয়ার পদ্ধতি কি? ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে পাক থেকে কয়েকটি

আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর খাস বান্দাগণের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যায়, কে আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা। এখন যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হিসেবে গঠন করতে চান তারা নিজের ভিতর বর্ণিত গুণাবলী তৈরি করুন। আয়াতে বর্ণিত আমল কটির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করলেই আপনারা আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হতে পারবেন। আয়াতের বিস্তারিত আলোচনাটাকে আমি সহজে বঝার জন্য এখানে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ চারটি আমল বা মুমিনের চারটি বৈশিষ্ট্য পৃথক করে তুলে ধরছি। এতে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

وَعِبَـٰادُ الرَّحْمَـٰنِ 'রাহমানের বান্দা'। আল্লাহ তা'আলার খাস, পছন্দনীয় বান্দা কারা, কি তাদের গুণাবলী?

আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাদের সর্বপ্রথম পরিচয়ই হলো তাঁরা বিনয়ী হবে, বিনম্র পদচারণা হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

যারা পৃথিবীতে ধীর পদে (বিনম্রভাবে) চলে।

ভূমণ্ডলের উপর যখন চলাফিরা করে, তখন বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফিরা করে। তারা এ কথা মনে করে যে, আমাদেরকে এ মাটি হতে সৃষ্ট করা হয়েছে আবার একদিন এ মাটিতেই ফিরে যাব। এখানে তাদের চলার ভঙ্গি বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, কেননা হৃদয়ে অহংকার পূর্ণ করে, মনের গহীনে অহমিকা জমা করে। শুধু বাহ্যিক চলাচলে বিনয় প্রদর্শন করলে তা কিন্তু কিছুতেই প্রশংসনীয় নয়। মূলত একজন মানুষের স্বভাবগত ভাব, চরিত্র মাধুরী থেকে সে সবসময়ের জন্য বিনয়কে গ্রহণ করতে পারে। অন্ত রাত্মকে বিনয় দ্বারা পরিপূর্ণ করে সেটাকে বাহ্যিক কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করাই হবে পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ।

সুতরাং আয়াতে পৃথিবীতে ধীর পদে চলার দ্বারা উদ্দেশ্যই হলো, সে স্বভাবগতভাবে বিনয়ী হবে, অন্তর থেকে নিজেকে ছোট ও সাধারণ মনে

করবে; চলাফিরা যা বাহ্যিক লোক সম্মুখে প্রকাশ হয় তাও বিনয়ের সাথে হবে, তথা জমিনের উপর বিনয় ও বিনম্রতার সঙ্গে চলাফিরা করবে। আর এটা প্রত্যেক মুমিনের জন্য শরীয়তের হুকুম। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, বিজ্ঞ আলেম হোক বা যতবড় বিদ্যানই হোক, সকলের জন্য একই নির্দেশ– তা হল, সে নিজেকে অত্যন্ত ছোট ও ক্ষমতাহীন অধম মনে করবে। যে ব্যক্তি এ গুণটিকে নিজের অন্তরে ভাল করে বসিয়ে নিবে, তার জন্য ওয়াদা করা হয়েছে যে, من تواضع لله رفعه الله

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য নম্রতা গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করে দিবেন।'

বিনয় অর্থ এই নয় যে, শুধু মুখে মুখে নিজেকে অধম, নালায়েক, নাচিজ ইত্যাদি বলে দিলে অথচ ভিতরে সম্পূর্ণ উল্টা; বরং বিনয় অর্থ হল, নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সমীপে একান্ত ছোট, তুচ্ছ মনে করা যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার মূল্য ও মর্যাদা একেবারেই নগণ্য।

অধম চেনার কাঠি

স্বভাবতই এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, একজন শিক্ষিত, আলেম, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, সুন্নতের অনুরাগী, কী ভাবে একজন অজ্ঞ, জাহিল এবং নামায-রোযা ত্যাগকারীর তুলনায় নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করবে? একজন আলেম, জ্ঞানী, চরিত্রবান, আমলদার; দ্বিতীয়জন অজ্ঞ, জাহিল, চরিত্রহীন, বদকার। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির চাইতে অধম কিভাবে মনে করবে?

আসল কথা হল, উত্তম কি অধম, এর ভিত্তি পরিণামের উপর। আর পরিণামদর্শী কেউ নেই। এমন কেউ নেই যে বলে দিবে আমলদার আলেমের পরিণাম কী রূপ হবে এবং বদকার জাহিলের পরিণতি কীরূপ হবে। হতে পারে তার আখের উত্তম হবে। অসম্ভবের কিছু নয়, এমন হতে পারে। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোথাও একটি রাজপ্রাসাদ আছে, যেখানে পৌছতে একশ' ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি পেরুতে হয়। এক ব্যক্তি নব্বই ধাপ পেরিয়ে গেছে। আরেক ব্যক্তি মাত্র দশ ধাপ পেরিয়েছে। নব্বই ধাপ অতিক্রমকারীর এ ধারণা করা উচিত হবে না যে, আমি মঞ্জিলে পৌঁছে

গেছি। কেননা, তখনো যে কোন মুহূর্তে তার পদস্খলন হতে পারে। আর সেখান থেকে পদস্খলিত হলে, অবশ্যই নিচে আছড়ে পড়বে। সিঁড়ির দশ ধাপ অতিক্রমকারী ধীরে ধীরে চড়তে চড়তে সর্বোচ্চ ধাপে গিয়ে পৌছবে।

এ জন্য লোক নিয়োজিত রেখেছে, নিজে চেষ্টা করছে। আবার ভীতও হচ্ছে যে, না জানি পরিণাম কী অবস্থায় সমাপ্ত হয়! এ গেল নিজেকে তুচ্ছ ও সাধারণ পরিমাপ করার মাপকাঠি।

উত্তম হওয়ার মানদণ্ড

উত্তম হওয়ার ভিত্তি ভাল-মন্দ আমলের উপর। যার আমলের মাঝে মন্দের পরিমাণ বেশি সেই নিকৃষ্ট, অধম। আর যার আমলের মাঝে মন্দের পরিমাণ সামান্য, সেই উত্তম। সাধারণত মানুষ অন্যের মন্দকাজ বা গুনাহের কাজ সম্পর্কে একেবারে কমই জানে। দু'চারটি হয়তো একজনের নজরে পড়বে, এর চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু প্রত্যেকের নিকট নিজের পাপাচারের কথা জানা রয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যেগুলোর ব্যাপারে অন্যরা কেউ জানে না। এ হিসাবে সে ভাববে, আমি কত নিকৃষ্ট অধম। অন্যের ব্যাপারে যেহেতু কম অবগত, এ জন্য মনে করতে হবে সে উত্তম।

আল্লাহ তা'আলার আযমত ও বড়ত্বের হক হল, তাঁর সমীপে প্রত্যেকে বিনয় ও বিনম্রতা গ্রহণ করবে এবং নিজেকে ছোট ও অযোগ্য মনে করবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অবস্থা ও মর্যাদা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

রাহমানের বান্দা তারাই যারা জমিনের উপর নম্রভাবে চলাফিরা করে।

নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করছ যে, আমি বহু লেখাপড়া করেছি, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিক পরিমাণ জানা, আমি অন্যদের চাইতে প্রবীণ, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বেশী। অথচ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা জায়েয নেই। আসল কথা হল, নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা, শ্রেষ্ঠতর ভাবা জায়েয নেই। ওয়ায়েজ, মুবাল্লিগ, মুহাদ্দিস, মুফতী নিজেকে ছোট মনে করা উচিত। ওয়ায়েজ, মুবাল্লিগ, মুহাদ্দিস, মুফতী মুহাক্কিক কিংবা মুফাক্কিহ হোক। সে সমাজ সংস্কারক অথবা প্রভাবশালী কেউ হোক তবুও নিজেকে ছোট মনে করবে। বাদশাহর পুত্র অপরাধ

করেছে। মহামান্য আদালত চাবুক মারার নির্দেশ জারি করেছে। জল্লাদ যখন চাবুক দিয়ে আঘাত করে, তখন কি সে নিজেকে খুব বড় মনে করে? না; বরং সে মনে করে, আমি তো জল্লাদ; চাবুক মারাই আমার কাজ। আর তিনি শাহজাদা কিংবা যুবরাজ। আদেশ হয়েছে, তাই চাবুক মারছি। নসীহত ও উপদেশ করার সময় এবং পাঠদানকালেও একথা স্মরণ রাখবে যে, আমি অধম, কে জানে আমার পরিণাম কীরূপ হবে!

বিনয়ের উপকারী ফল

যখন কেউ নিজেকে ছোট মনে করবে, অধম মনে করবে, তখন সে কাউকে কষ্ট দিবে না, পেরেশান করবে না; বরং সে তখন শুধু এ চিন্তা করবে যে, আমার থেকে কেউ কোনরূপ কষ্ট না পায়। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবে। কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। সকলের আচরণ ও অবস্থা যখন এরূপ হবে, তখন জীবন সহজ ও সুন্দর হয়ে ওঠবে। আরামে ও নিরাপদে সবাই জীবনযাপন করতে থাকবে। কেউ কারও থেকে অনিষ্টতার আশঙ্কা করবে না। এ জন্যই বিনয় ও অক্ষমতাকে আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাদের পরিচয় ও নিদর্শন বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা ও খাস গোলাম হতে চায়, সে নিজের অন্তরে যেন এ বৈশিষ্ট্য ভালভাবে তৈরি করে।

সত্যনিষ্ঠ ও বিনম্রজনের সাহচর্য গ্রহণ

বিনয় ও নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি হবে? মানুষের মধ্যে বড়ত্ব ও অহংকার মজ্জাগত ও সহজাত বিষয়। তাই প্রতিকারের জন্য চেষ্টা-তদবির করতে হবে। যাদের অন্তরে বিনয় ও নম্রতা আছে, তাদের সাহচর্যে বসবে। যাদের মধ্যে বিনয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাপত্র আছে, তাদের কাছে নিজের অবস্থা খুলে বলবে। তারা যে সব ব্যবস্থাপত্র বাতলে দেবেন, গুরুত্বসহকারে তা পালন করবে। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে–

کونوا مع الصادقین

সত্যনিষ্ঠদের বন্ধুতা গ্রহণ কর।

সত্যনিষ্ঠ ও পূর্ণমানবগণের পথে চলতে হবে। তাদের অনুসৃত পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রতিদিন বহুবার নামাযের মধ্যে তিলাওয়াত করা হয়– اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

হে আল্লাহ! আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

সরল পথ কী? অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ। আল্লাহ যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন, দয়া ও করুণা করেছেন, তাদের পথই সরল পথ, সত্য পথ। কাদের উপর আল্লাহ পাকের অনুকম্পা বর্ষিত হয়? এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে অন্য আয়াতে–

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا

এবং যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের তাবেদারী করবে তারা আখেরাতে সে সমস্ত লোকের সাথী হবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ এবং তারাই সর্বোত্তম সাথী। -সূরা নিসা-৬৯

বিনয়ী ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করবে, তাদের খেদমতে অবস্থান করবে। এটাই এক প্রকার কার্যকরী ঔষুধ।

অহংকারীদের সংস্রব বর্জন

অহংকারীদের গঠন-গাঠন, বেশ-ভূষা, চলন-বলন, আকার-আকৃতি মোটেও অনুসরণ করবে না। তাদের অনুকরণ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে। অহংকারীদের স্টাইল, আকার-আকৃতি গ্রহণ করবে, আর তোমার মাঝে অহংবোধ জন্মাবে না, এটা কি করে সম্ভব!

এ কারণেই উত্তম হল, অহংকারীদের সোহবতে আসবে না, তাদের চলন-বলন কিছুই গ্রহণ করবে না। তাদের বাহ্যিক অনুকরণে নিজের অন্তরেও অহংকারের সৃষ্টি হবে। সিংহের চামড়ায় বসবে না, বসলে অহংকার সৃষ্টি হবে, বড়ত্ব ভাব জাগ্রত হবে। বকরির চামড়ায় বসবে, এতে অন্তরে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে।

অহংকারীর অনুকরণের পরিণাম

অহংকারীদের গঠন প্রকৃতি হল টাখনু ঢেকে পোশাক পরা। এ কারণে পুরুষকে টাখনু না ঢেকে খোলা রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্যান্ট, পাজামা ও লুঙ্গি দ্বারা টাখনু ঢেকে রাখা অহংকারীদের অন্যতম আলামত। যদি দাম্ভিক লোকদের স্টাইল ও আকৃতি গ্রহণ কর, তা হলে কি নিজের মধ্যে অহংকারবোধ জাগ্রত হবে না? তোতলামির ভান করলে আপনা-আপনিই নিজের মধ্যে তোতলামি ভাব সৃষ্টি হয়ে পড়ে, ইচ্ছা করার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপ যখন অহংকারীদের অনুকরণ করবে, তখন এমনি এমনিভাবেই নিজের মধ্যে অহংবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে। তাকাব্বুর ও অহংকার হারাম এবং যে সমস্ত বস্তু অহংকার ও দাম্ভিকতার উপকরণ হয় তাও হারাম। এজন্যই টাখনু ঢেকে কাপড় পরার ব্যাপারে হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারীর সাজা

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে গেল। আমরা টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করাকে খুব মামুলি বিষয় মনে করি, অথচ এটা মস্তবড় গুনাহের কাজ। এ ব্যাপারে কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ثلثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر اليهم ولايزكيهم ولهم عذاب اليم

তিন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর পর তিনবার এ কথা বললেন। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়া এ লোকগুলো কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী, উপকার করে খোটাপ্রদানকারী ও মিথ্যা শপথ করে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী।

টাখনু ঢেকে, টাখনুর নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে লুঙ্গি, পাজামা, সালোয়ার ও প্যান্ট পরিধানকারীদের ব্যাপারে কী কঠিন সতর্কবাণী এসেছে! রাসূলের ইরশাদ অনুযায়ী তাদের উপর চারটি শাস্তি আরোপিত হবে।

এক. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

দুই. আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। রাব্বুল আলামীন, যিনি সকলের প্রেমাস্পদ হওয়ার কথা তিনি মুখ ফিরিয়ে নিবেন। কত কঠিন বিষয়, কী ভয়ানক সাজা! কারো অভিভাবক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এর চাইতে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে?

তিন. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করবেন না। এ ধরনের লোকেরা যতক্ষণ তাওবা না করবে, আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের সুযোগ ও তাওফিক দেওয়া না হবে তারা খাস বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। তাদের বিলায়েত ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন হবে না।

চার. তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে ভীষণ আযাব। এগুলো টাখনুর নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পোশাক পরিধানকারীদের ভয়াবহ পরিণতি সংবলিত হাদীসের বর্ণনা।

অন্যদিকে যারা বিনয় ও তাওয়াযু অবলম্বন করতে আগ্রহী, তারা এ দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

এক. আহলে তাওয়াযু বা বিনয়ী ও বিনম্র ব্যক্তিবর্গের সোহবত ও সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং তাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখবে।

দুই. অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের আচার-অভ্যাস গ্রহণ করবে না। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি গ্রহণ করবে না। এ দুটো বিষয়ের উপর আমল করলে, অন্তরে বিনয় ও তাওয়াযু সৃষ্টি হবে; যা আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাগণের প্রথম সিফত ও বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا

আল্লাহওয়ালার দ্বিতীয় সিফত ও বৈশিষ্ট্য হল, তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম। অর্থাৎ তারা শান্তি কামনা করে, তর্কে লিপ্ত হয় না।

এখানে আল্লাহওয়ালার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বয়ান করা হয়েছে যে, অন্যের সঙ্গে তার আচরণ ও আলোচনা কীরূপ হবে! প্রথম বৈশিষ্ট্য, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তার সম্পর্ক বিশেষভাবে বান্দার আমলের সঙ্গে ছিল, যা তার চলা-বলা, বিনয় ও বন্দেগীতে প্রকাশ ঘটত। এরপর অন্যের সঙ্গে তার আচরণবিধি কিরূপ হবে, তা বাতলে দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন তার সঙ্গে অসংযত ও অসঙ্গত কথা বলে, তার উপর আপত্তি তোলে, যখন তাকে উত্যক্ত করে, কটাক্ষ করে, তখন সে শান্তির কথা বলে, শান্তি আহ্বান করে, উদ্ভট বিতর্ক বা বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় না। সে চায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হোক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে ছাড় দেয়, উদারতা প্রদর্শন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا سَمِعُوا۟ اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَا أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَـٰهِلِينَ

আর তারা যখন অযথা কথা শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং শান্তভাবে বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি তোমাদের জন্যে। তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা নির্বোধ লোকদের সঙ্গ চাই না। -সূরা কাসাস- ৫৫

এটি আল্লাহওয়ালার মর্তবা, যখন কেউ কিছু বলাবলি করে, তখন সে কঠিন পরিস্থিতিকে নিজেতেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। সবকিছু সহ্য করে নেয় এবং এমন আচরণ ও মোয়ামেলা করে, যার দ্বারা ফিতনা ও ফাসাদ কেটে যায়। আর এই আচরণ তখনই প্রকাশ পায়, যখন মানুষের মধ্যে নিচুতা, নিঃস্বতা ও অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি মূলত প্রথম বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে শান্তির

কথা বলে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হতে চায়, তার নিজের মাঝে এ গুণাবলী তৈরি করতে হবে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَـٰمًا

আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দার তৃতীয় পরিচয় এই যে, তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।

আল্লাহওয়ালাগণের পরিচয় হল, তারা রাত্রি যাপন করবে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায়। এ আলোচনা বিশেষভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, রাত্রি হলো ঘুমোবার জন্য। এতে নামায ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য কিয়াম করা এবং তাতে মশগুল থাকায় বিশেষ ধরনের কষ্ট-মুজাহাদা বর্তমান। এমন মুহূর্তে আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিমগ্ন থাকেন।

তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত

তাহাজ্জুদের ফযিলত সম্পর্কিত আরেকটি কথা বলে নেওয়া দরকার মনে করছি। মূলত তা হাদীসেরই কথা, যা হারদুই মাদরাসার শিশুদেরকেও মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়। এর বরকতে, মাশাআল্লাহ বড় ছাত্ররা এর আমলি পাবন্দি করে। এ ব্যাপারে প্রতিদিন এক এক বিষয় করে বলব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম দিন.

عليكم بقيام الليـــل তোমাদের উপর রাত্রিজাগরণ তথা তাহাজ্জুদের পাবন্দি করা জরুরি। –তিরমিযী, মিশকাত : ১/১০৯

এটি প্রথম দিনের সবক, রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামায পড়াকে তোমরা নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নিবে। প্রত্যেকেরই তাহাজ্জুদ পড়া উচিত এবং প্রত্যক দিন নিয়মিত পড়া উচিত। একদিন অনেক রাকাত পড়া হলো এরপর এক সাপ্তাহ বাদ এমন নয়। ব্যস, আজ এতটুকুই। এটাকে মুখস্ত করে আমলে পরিণত করে নাও। এভাবে মুখস্থ করে নেওয়া সহজ।

দ্বিতীয় দিন.

فانه دأب الصالحين

কারণ, তা (রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করা) তোমাদের মধ্যকার নেক বান্দাদের অভ্যাস।

এতটুকুই দ্বিতীয় দিনের সবক, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় কর। কারণ রাত্রিজাগরণ নেককার ও আল্লাহওয়ালাদের স্বভাব। রাতে ঘুমিয়ে উঠার পরে নামায পড়াকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে উঠার পর নামায আদায় করে, শরীয়ত তাকে তাহাজ্জুদগুজার বলে।

–তাফসীরে কাবীর- ২১/৩০

তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্য এটাই যা বলা হল। এটি নেককার ও আল্লাহওয়ালাদের অভ্যাস– এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

সাধারণ মানুষের স্বভাবই হল, সময়ের বুযুর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের অনুকরণ করা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের পদাংক অনুস্মরণ করা। এতে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ করেই যখন রোযার মত একটি কঠিন ইবাদত ফরয হওয়ার হুকুম প্রদান করা হল, তখন সাথে সাথে এ কথাও বলে দেয়া হল যে, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের উপরও এ রোযা ফরয ছিল। পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয ছিল। হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে। -সূরা বাকারা-১৮৩

স্পষ্টতই রোযার মধ্যে কষ্ট বিদ্যমান, তাই সহজীকরণের জন্য এই বর্ণনারীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এমনিভাবে রাত্রে জাগ্রত হওয়া, তারপর নামায পড়া; এর মধ্যেও কষ্ট-মোজাহাদা রয়েছে। এটা যাতে সহজ হয়ে ওঠে, এ জন্য বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার যে সকল

নেককার বান্দা অতিবাহিত হয়েছে, তাদের পরিচয় এই ছিল যে, তারা সকলেই নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।

এটি মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম

তৃতীয় দিন.

وهو قربة لكم الى ربكم

আর এ আমল তেমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্যশীল করে দিবে।

এতটুকু তৃতীয় দিনের সবক। তাহাজ্জুদের ফায়দা কী? তাহাজ্জুদ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিবে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল করে দিবে। ফরয-ওয়াজিব অবশ্য পালনীয় ইবাদত। প্রতিদিনের নির্ধারিত কর্তব্য, জরুরি ভিত্তিতে পালনীয় ইবাদত। নফল ও তাহাজ্জুদের প্রতি যখন গুরুত্ব দিবে, তখন তার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। হাকিমের হুকুম মান্য করা জরুরি কিন্তু চার কি আট দিন পর পর তার কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করা, কাজের বিবরণ পেশ করা, এটা জরুরি নয়। তবে যদি এমন কিছু করা হয়, তা হলে হাকিমের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। এটা এমন হচ্ছে যে, আমরা সড়কের উপর দিয়ে হেঁটে চলছি, আর হাকিম সাহেব গাড়িতে আরোহণ করে চলছেন, এদিক ওদিক মনোযোগ দিচ্ছেন না। কেননা, সবার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক রাখা, কুশল বিনিময় করা- এটা তার দায়িত্বের বাইরে। সাধারণের সঙ্গে তার এরূপ আচরণ।

যে অসাধারণ, খাস মানুষ, দু'চার দিন পর পর তার কাছে আসা-যাওয়া করে, উপহার বিনিময় করে, যা তার উপর জরুরি ছিল না। এই যে বার বার গমনাগমনের দ্বারা যে ব্যক্তি সম্পর্ক আন্তরিক করে তুলেছে, প্রগাঢ় করে রেখেছে, তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে? গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞাস করবেন হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছ? সে বলবে অমুক স্থানে যাচ্ছি কিন্তু রাস্তায় কোন গাড়ি পাচ্ছি না। তখন হাকিম সাহেব বলবেন, আচ্ছা আসুন, উঠুন আমার গাড়িতে। আপনাকে আমি ওখানে পৌছে দিয়ে আসি। অথচ হাকিমেরও দায়িত্ব এটা নয় যে, সর্বসাধারণকে

তিনি তাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌছে দেবেন। কিন্তু তার সঙ্গে এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ কেন করা হল? কারণ দায়িত্বের বাইরে তার যে বিষয়ের প্রয়োজন ছিল না, সে ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছে। তাহাজ্জুদের সম্পর্কটাও অনুরূপ। এটি বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল করে দেয়।

দীনী শিক্ষার সহজ পদ্ধতি

এক এক ফায়দা এক একদিন শিশুদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিবে। মাশাআল্লাহ, তারাও মুখস্থ করে নিবে। মুখস্থ করার কত সহজ পদ্ধতি যে, প্রতিদিন একেকটি করে বিষয় বলে দেয়া হবে। যারা শোনবে তাদের বাড়তি কোন সময় দিতে হচ্ছে না, বেশি সময় তো নয়; আবার দীনের একটি বিষয়ও সহজে জানা হয়ে যাচ্ছে, মুখস্থ করে নেয়া যাচ্ছে। এভাবে আস্তে ধীরে দীনের বহু বিষয় জানা সম্ভব হয়ে ওঠবে। বিন্দু বিন্দু মিলেই সিন্ধু। এখন প্রয়োজন শুধু এতটুকু চিন্তা, একটু গুরুত্ব প্রদান।

তাহাজ্জুদের আরও উপকারিতা

তাহাজ্জুদের আর কী ফায়দা?

مكفرة للسيآت

তাহাজ্জুদ হল গুনাহের কাফ্ফারা। -মিশকাত : ১/১০৯

তাহাজ্জুদ নৈকট্যকে বাড়িয়ে তোলে, গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে। তাহাজ্জুদের সময় যখন কান্নাকাটি ও রোনাজারি করবে, তখন কবিরা গুনাহও মাফ হয়ে যাবে, গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে ওঠবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, অযুর দ্বারা গুনাহ দূরীভূত হয়ে পড়ে। কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে– ان الحسنات يذهبن السيآت

পুণ্য পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। কবিরা গুনাহর জন্য তাওবা জরুরি। এখানেই শেষ নয়, তাহাজ্জুদের আরও ফায়দা আছে। ومنهاة عن الاثم তাহাজ্জুদ গুনাহ প্রতিহতকারী।

কতক জিনিসের এই বৈশিষ্ট্য থাকে যে, তা রোগীর জন্য রোগ প্রতিরোধকারী আবার রহিতকারী। তাহাজ্জুদের এই বৈশিষ্ট্য যে, এর দ্বারা গুনাহও মাফ হয়ে যায়। আবার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি সৃষ্টি হয়।

তাহাজ্জুদ গুনাহ প্রতিরোধকারী এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারীর জন্য রহিতকারী। এটি নামাযেরও বৈশিষ্ট্য। যদি সুন্নত অনুযায়ী পড়া হয়, গুরুত্বসহকারে আদায় করা হয়, তা হলে এই নামায গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।

পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নামায অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। -আন্‌কাবূত-৪৫

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, এক ব্যক্তি চুরি করত, আবার নামাযও পড়ত। একদিন সে নামায পড়ছিল। কেউ বলল, হুযুর! এই লোক চুরিও করে, আবার নামাযও পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অচিরেই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত করবে। তবে নামায নিয়ম অনুযায়ী পড়বে। নামাযের আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রেখে পড়বে, তবেই আশা করা যায় তাহাজ্জুদ ফলপ্রসূ হবে। এখন যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হতে চাও, তা হলে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়। তাহাজ্জুদকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নাও।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, এতে এ কথার উপর তম্বি করা হয়েছে যে, তোমরা এর অধিক উপযুক্ত। কারণ তোমরা সর্বশেষ উম্মত এবং এ কথার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ না পড়ে সে কামেল ও পরিপূর্ণ মুত্তাকী ও সালেহগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে বরং ওই লোকের মত, যে বাহ্যিকভাবে আত্মশুদ্ধি করেছে বটে, তবে অভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্য রকম। -মিরকাত ৩/১৪৮

আচ্ছা, যে ব্যক্তি রাত জেগে নফল ইবাদত করে, সে কি ফরয ইবাদত ছেড়ে দিবে? সুন্নতে মোয়াক্কাদা ছেড়ে দিবে? মাগরিবের পরের ছয় রাকাত নফল কি সে ছেড়ে দিতে পারে? এশরাক ও চাশতের নামায কি সে পড়বে না? ঘুমুতে যাওয়ার সময় সে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে না? সে কি

দিনের ইবাদতসমূহকে পরিহার করতে পারে? সে তো বরং এ সব ইবাদত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আঞ্জাম দিবে।

ইতিহাসে পাওয়া যায়, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইতিহাসখ্যাত জালিম। প্রতিদিন দু'শ রাকাত নফল নামায পড়ত। সেকালের একজন জালিমের অবস্থা যদি এই হয়, আবেদগণের অবস্থা তা হলে কেমন ছিল? তাদের মধ্যে দিন-রাত পাঁচশ' রাকাত, হাজার রাকাত নফল আদায়কারী অনেক ছিলেন। জালিম পড়ত দু'শ রাকাত। সালেহ ও মুত্তাকীদের অবস্থা কেমন ছিল এটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়।

আল্লাহওয়ালার দিন-রাত

আল্লাহ তা'আলার যে খাস বান্দা দিন-রাত তার অবস্থা ও আচরণ কীরূপ থাকে, নিজের ও অন্যের সঙ্গে তার আচরণ কেমন হয়, আবার আল্লাহ তা'আলার সাথে কীরূপ হয়, তার আলোচনা করা হচ্ছে।

আল্লামা ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, শোন; আল্লাহ তা'আলা দিনের আচরণবিধি দু'রকম বয়ান করেছেন।

এক. অন্যকে কষ্ট প্রদান না করা। يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

আয়াত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

দুই. অন্যের কষ্ট বরণ করা এবং وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَـٰهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

আয়াত দ্বারা এ উদ্দেশ্য।

মোদ্দাকথা হল, আলোচ্য আয়াতে ঐ সমস্ত আচরণবিধির কথা বয়ান করা হয়েছে, যা রাত্রিবেলা স্রষ্টার সেবায় নিয়োজিত থাকাকালীন হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা, দিনে তার আচরণ হবে নিরীহ ও আমিত্বহীন এবং রাত্রিতে সে রোনাজারি আর তাহাজ্জুদের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

✡ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ✡ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে সরিয়ে রাখুন। নিশ্চয়ই তা আশ্রয়-স্থল এবং বসতি হিসেবে অত্যন্ত জঘন্য। -সূরা ফুরকান- ৬৫, ৬৬

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা, সে সর্বদা ইবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত থাকার সাথে সাথে আশঙ্কিত থাকে, আমি অক্ষম, আমার আমল অসম্পূর্ণ। আর দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন ও আযাব থেকে বাঁচাও। সে কখনও এমন করে না যে, আমি তো আমল করেছি, ব্যস; জান্নাতের যোগ্য ও হকদার আমি হয়ে গেছি। বরং সে আমল করতে থাকে এবং আশঙ্কায়ও থাকে। আমল করতে গিয়ে সে আদৌ একথা ভাবে না যে, আমি বড় হয়ে গিয়েছি। তার ভিতরটা বরং বিনয় ও আল্লাহ ভীতির আধার।

জাহান্নামের আযাব ভীষণ কঠিন, অত্যন্ত ভীতিকর। পৃথিবীর আগুনের প্রতিক্রিয়া সামান্যমাত্র, জাহান্নামের আগুন একদম হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। জাহান্নাম সর্বনিকৃষ্ট আবাসস্থল। দুনিয়ার জেলখানায় কেউ যেতে চায় না, তা হলে ঐ জেলখানা যার নাম জাহান্নাম তাতে থাকার জন্য কে তৈরি হবে? দুনিয়ার জেলখানায় মানুষ কেন যায় বা কেন যেতে হয়? নাফরমানি ও অবাধ্যতার কারণে, রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করার কারণে জেলখানায় যেতে হয়। এমনিভাবে যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থাকবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে। কখনো কখনো ভুল-বিচ্যুতি হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নিবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে বেশি বেশি কান্নাকাটি করবে। গুনাহের অভ্যাস করবে না।

গুনাহের অভ্যাস হয়ে পড়া ভীষণ চিন্তার কথা। মোটকথা, যদি আল্লাহর খাস বান্দা হতে চাও, তা হলে এ বিষয়টিও অন্তরে বদ্ধমূল করে নাও যে, আমল করে নিজেকে নিজে বড় মনে করবে না; বরং আমল করতে থাকবে এবং আশঙ্কায়ও থাকবে, আবার দু'আও করতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা হওয়ার জন্য, আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য বহু বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে চারটির কথা বলা হল। এই চারটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলার অলী ও বন্ধু হওয়ার জন্য জরুরি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য, জমিনে বিনীত ও বিনয়ী পদচারণা করে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, কেউ তাদের মন্দ সম্বোধন করলে, তারা তাদের শান্তি কামনা করে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, তারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে, তাহাজ্জুদের পাবন্দি করে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, তারা জাহান্নামের আগুন ও আযাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দু'আ প্রার্থনা করে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত প্রাপ্তি দুটোই জরুরি

জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তবে জান্নাতে লাভ করাও কম জরুরী নয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় দু'টি বিষয়ই আসা প্রয়োজন। কোন এক ব্যক্তি কারাগার থেকে হিফাজতে থাকল, কিন্তু তার বসবাসের জন্য, আরাম-আয়েশের জন্য সুন্দর আরামদায়ক বাড়ি নেই। তবে কিভাবে তার জীবন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হবে? এ কারণে উভয় কাজই জরুরি। সৌভাগ্যবান ও সফলকাম ঐ ব্যক্তি যে উভয়টি অর্জন করে নিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম। -সূরা আল-ইমরান-১৮৫

এ কারণে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি, যার অত্যন্ত সহজ পথ হল গুনাহ থেকে বাঁচা। সাথে সাথে সুন্নত তরিকায় ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে চিন্তা করা এবং চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরী।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হওয়ার উপায় কি? তার উত্তরে বলা হয়েছে; কুরআনুল কারীমে বলে দেয়া হয়েছে, এ এ

সিফত নিজের ভিতরে সৃষ্টি করে নেয়ার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হয়ে ওঠে। এসব গুণাবলীর কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

হারাম শরীফের সময় অত্যন্ত মূল্যবান

আরেকটি বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার। প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রত্যাশা যে আমাদের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন হোক। কিন্তু এর পদ্ধতি কি? কোন সমস্ত গুণাবলী অর্জনের দ্বারা সে সফলতা অর্জন করা যায়? কুরআন কারীমে এ ব্যাপারে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সে সাতটি বৈশিষ্ট্য থেকে এখানে শুধু একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

আকৃষ্ট করা বয়ানের উদ্দেশ্য এই যে, যারা অসার ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত থাকে। আয়াতে গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং বেহুদা ও অসার বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। অসার বা বেহুদা বলা হয় ঐ সমস্ত কাজ বা কথাকে যা দীন বা দুনিয়া কোনটারই ফায়দা হয় না।

অসার কাজও হতে পারে, আবার কথাও হতে পারে। বলা হয়েছে, সফলকাম সে সব মানুষ, যারা অসার কথা ও অসার কাজ থেকে বেঁচে থাকে। তা হলে তো হারাম শরীফে এ ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এ মুবারক স্থানের প্রতিটি মুহূর্ত বড় মূল্যবান, অত্যন্ত মর্যাদাময়। এ স্থানে অবস্থানের পূর্ণ সময় জুড়ে যথাসম্ভব ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকবে। বেহুদা ও অর্থহীন কাজ থেকে বেঁচে থাকা এমনিতেই জরুরী। তবে মুবারক স্থান হারাম শরীফে বেহুদা ও অনর্থক কর্মে লিপ্ত হওয়া কত জঘন্য বিষয়টি একটু ভেবে দেখা দরকার।

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) সকলকে একটি বিষয়ে সংযত থাকতে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি বলতেন, বেশি খাও, বেশি ঘুমাও। কিন্তু কথা কখনো বেশি বল না। হারাম শরীফে হাজির হওয়ার সুযোগ ও তাওফীক যাদের হয়েছে, তাদের উচিত আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা যে, তিনি তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। যতদিন এ স্থানে

থাকার সুযোগ হয়, একে গনিমত মনে করা উচিত। এ স্থানের বরকত ও প্রাচুর্য অধিক থেকে আরও অধিক অর্জনের চিন্তা-ফিকির ও চেষ্টা করা উচিত।

বাজারের সাথে সম্পর্ক

বাজারেব সাথে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পর্ক রাখবে। বাজার অপছন্দনীয় স্থান। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

ابغض البلاد الى الله اسواقها

আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বনিকৃষ্ট স্থান হল বাজার।

-মিশকাত শরীফ ১/৬৮

এ কথা স্পষ্ট যে, প্রয়োজনবশত মানুষ টয়লেটের সাথেও সম্পর্ক রাখে। প্রয়োজনে টয়লেটে যায়, কিন্তু বেশি সময় সেখানে থাকে না। সে স্থানে বেশি সময় থাকলে দুর্গন্ধে কষ্ট হয় বটে, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বাজারে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

ব্যবসায়ীর জন্য সার্বক্ষণিক সতর্কতা প্রয়োজন

যারা ব্যবসা করে বা বাজারেই অবস্থান করে তাদের বিষয়টি অপারগতার অন্তর্ভুক্ত। তথাপি তাদের জন্যও হুকুম হল, বাজারে খুব সতর্কতার সাথে থাকবে। যেভাবে একজন ড্রাইভার গাড়ি চালায়; সব সময় নিজের ডিউটিতে থাকে। তার প্রতিটি মুহূর্ত শঙ্কায় কাটে। সামান্য ভুলের কারণে, একটু অনিয়ম-অসতর্কতার কারণে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু যে গাড়ি চালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত, তার হাত-পা, চোখ-অন্তর তথা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্মব্যস্ত থাকে, সজাগ থাকে, নিয়মের বাইরে কিছুই করে না। অসংখ্য ড্রাইভার নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি চালাচ্ছে। ঠিক এমনিভাবে যে ব্যক্তি বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, সেও সার্বক্ষণিক গুনাহের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকবে। তার জন্য প্রয়োজন গাড়ি চালকের মত যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, পরিপক্কতার সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি। অন্যথায় এতটুকু গাফলতি বা অসতর্কতা এসে গেলে, সাথে সাথে স্খলন হয়ে যাবে, মারাত্মক গুনাহ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মগ্ন থাকা

মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) লিখেছেন, মিনায় এক ব্যক্তি ব্যবসা করত। মিনায় তার পঞ্চাশ হাজার আশরফির ব্যবসা ছিল। মুজাদ্দেদ (রহ.) তার প্রতি মনোনিবিষ্ট করে জানতে পারলেন যে, তার এই ব্যবসায়িক ব্যস্ততার মধ্যেও অবস্থা এই ছিল যে, এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল কাটত না। এই ব্যক্তি ব্যবসাও করছে, আবার মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নিবিষ্ট রাখছে। এক সময়ে দুই কাজ। এখন যেমন হচ্ছে যে, মসজিদে বসে আছে, তো অন্তরটা ঘরে পড়ে থাকছে- এখানে কেন সম্ভব নয়!

হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে কয়েক শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে। তাদের মধ্যে একশ্রেণী হল, যাদের অন্তরাত্মা সর্বদা মসজিদে পড়ে থাকে। মসজিদ থেকে চলে গেলে, ফিরে আসা পর্যন্ত ভাবতে থাকে, কখন আবার মসজিদে হাজির হবে।

-বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ ১/৬৮

নামায পড়ে এসেছো। কখনো কি চিন্তা করেছ, আবার কখন জামাতের সময় হবে। কখন আবার নামাযের জন্য মসজিদে যাবে। নামাযের সঙ্গে সম্পর্ক এমন যে, দোকানে বসে আছে, বেচাকেনা করছে, কিন্তু অন্তর মসজিদের দিকে।

আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত সমস্ত কল্যাণের উৎস

অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে তো, কাজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুযোগ খুঁজবে, কখন সুযোগ পাওয়া যায় প্রেমাস্পদের দরবারে হাজিরা দেয়ার। দুনিয়ার ভালোবাসা যেমন সকল খারাপের উৎস, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত সমস্ত কল্যাণের উৎস। ভিতরে প্রস্তুতি নিবে, অন্তরে সংশোধন আনবে। অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় ও ভালোবাসা বদ্ধমূল করে নিবে। যদি ভিতরগত প্রস্তুতির না নেয়া যায়, বাইরের প্রস্তুতি কোনই মূল্য নেই। সামান্য স্খলনেই সবকিছু খতম হয়ে যেতে পারে। এর উদাহরণ ঠিক এরূপ যে, একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপটি বেশ উন্নত। তার ভিতরে কেরোসিন ভর্তি, কিন্তু সামান্য ঝড়ো হাওয়ায় তা নিভে যায়।

অন্যদিকে একটি ছোট্ট বাল্ব জ্বলছে। পাওয়ার হাউজের সাথে তার সম্পর্ক। কিন্তু ঝড়ো হাওয়া তা নিভাতে পারছে না। অন্তরে মুহাব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হলে, মুহাব্বত পরিপূর্ণ হলে, আনুগত্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সম্পর্কহীন অবস্থা ভাল পরিবেশেও উপকার হয় না

এখানে আরেকটি বিষয় জানা দরকার। মানুষ বলে থাকে যে, জনাব! আমরা কী করব, পরিবেশ পাল্টে গেছে। এ কথা যথার্থ নয়। পরিবেশগত প্রভাব তো ঠিকই পড়বে, যদি সেই পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে থাকে। পরিবেশ যদি ভালো হয়, অন্তর যদি প্রস্তুত থাকে, তা হলে অন্তরে ভালো প্রভাব পড়বে। পরিবেশ যদি খারাপ হয়, অন্তরে যদি খারাপ কিছু থেকে থাকে, তা হলে অবশ্যই পরিবেশগত প্রভাব পড়বে। আসল হল ভিতরের খারাবি। ভিতরগত বিষয়। একথা আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না। কুরআনে পাক থেকে বলছি। ফিরিশতা ও ইবলিস সবাইকে নির্দেশ করা হয়েছে- اسْجُدُوا لِآدَمَ তোমরা সবাই আদমকে সিজদা করো। হুকুম তামিলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- فَسَجَدُوا সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এর পর পরই ইরশাদ হয়েছে-

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

কিন্তু ইবলিস হুকুম অমান্য করল এবং অহঙ্কার করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। -সূরা বাকারা-৩৪

ইবলিস হুকুম তামিল করল না, অর্থাৎ সিজদা করল না। কেন সে এরূপ করল? যদি পরিবেশের প্রশ্ন ওঠে, তা হলে সে পরিবেশ অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ছিল। ফিরিশতাদের পরিবেশ। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মিকাঈল (আ.) এবং অন্য সমস্ত ফিরিশতা উপস্থিত। সকলে আদেশ মান্য করল, কিন্তু ইবলিস অমান্য করল। কারণ, তার ভিতরে খারাবী ছিল। পরিবেশ তো ছিল উন্নত এবং উৎকৃষ্টতর কিন্তু তার ভিতরের খারাবীর কারণে সে পরিবেশের সাথে আদৌ সম্পর্ক ছিল না। ফলে এই অবস্থা হয়েছে।

মসজিদে নববীতে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াতেন। লোকজন তাঁর খিদমতে আসা-যাওয়া করত। তাঁর মজলিসে অংশগ্রহণ করত। মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছিলেন অকপট, একনিষ্ঠ, কিন্তু কিছু লোক তো এমনও ছিল যারা মুনাফিক হিসাবে পরিচিত। এতো সুন্দর পরিবেশেও তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ভিতরে খারাবী থাকার কারণে তাদের উপর পরিবেশের কোন প্রভাব পড়েনি। এর বোধগত উদাহরণ এই যে, এখন গরমকাল চলছে। কিন্তু এর আগে মে-জুন মাসে কী ভীষণ উত্তাপই না যায়! মনে হয় যেন সমস্ত স্থান থেকে আগুন ঝরছে। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি কম্বল জড়িয়ে এলো। চাঁদর মুড়ি দিয়ে এলো। এসে বলল, ভাই! সর্দি লেগেছে। অথচ আবহাওয়া গরম, সমগ্র পরিবেশ উত্তপ্ত। তা হলে, তার সর্দি কেন? সেই একই কথা এখানেও প্রযোজ্য যে, তার ভিতরে অসুখ আছে।

পাথরে উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয় না

কখনো এমন বলা হয় যে, ঐ মাদরাসায় কিংবা ঐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে এমন এমন লোকও আছে! এখানেও সে একই কথা। এর জন্য মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানটি দোষী সাব্যস্ত হবে না। এর ভিতরে নোংরামি আছে বলা যাবে না। সেখানকার পরিবেশ অবশ্যই দীনি পরিবেশ এবং উত্তম ও উন্নত পরিবেশ। কিন্তু ব্যক্তির ভিতরকার নষ্টামির কারণে পরিবেশে কোন প্রভাব পড়েনি, কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, সর্বত্র বৃষ্টি বর্ষিত হয়। বৃষ্টির কারণে সাধারণত মাটি থেকে উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পাথর থেকে কোন চারা অঙ্কুরিত হয় না। অথচ সমগ্র পরিবেশ সবুজ-শ্যামল। কারণ তার ভিতরে সমস্যা আছে।

অন্তর পরিবর্তনে জীবনের গতি পাল্টে যায়

ভিতরটা যখন ঠিক হয়ে ওঠবে, তখন সর্বদা আমলে সালেহ ও নেককাজ প্রকাশ পেতে থাকবে। অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার ভয় সৃষ্টি হয়, যদি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তা হলে সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গতিপথ পাল্টে যাবে। যা মুশকিল ছিল, তা সহজ হয়ে উঠবে।

ইলাহাবাদে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জাফরান, ঘি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস পরিমাণমত মেপে দেয়ার জন্য এলাকার জনৈক মুরব্বি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ঘি মাপার জন্য দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত করে। এক পাল্লায় ঘি আরেক পাল্লায় বাটখারা রেখে দাঁড়িপাল্লা তোলা মাত্র আযান শুরু হয়ে গেল। সাথে সাথে লোকটি কাজ ছেড়ে দিয়ে যে কামরায় বসে ছিল, জিনিসগুলো সেখানে রেখে, দরজায় তালা মেরে মসজিদে রওনা হয়ে গেলেন। লোকজন বলল, মাত্র দুই মিনিট লাগবে, মেপে যাওয়াই উচিত ছিল। তিনি কোনকিছু পরোয়া করলেন না, মসজিদে চলে গেলেন। বাহ্যত এ বিষয়টি সাধারণের জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যকর কিন্তু যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নিয়েছে, তাদের জন্য এ মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানা গেল, সে অমুক তারিখে দেশে পৌঁছে যাবে। তার আত্মীয়-স্বজন স্টেশনে এগিয়ে নিতে এলো। পরে তারা জানল যে, গাড়ি পৌঁছুতে আরও চার কি আট ঘণ্টা বিলম্ব হবে। ফলে তারা সবাই ফিরে গেল। এখন রাত একটা বাজে। দুই ঘণ্টা পূর্বে গাড়ি এসে পৌঁছেছে। আগমনকারী বাড়িতে এসে দরজা নক করে। ডিসেম্বর কি জানুয়ারির শীতের সময়। এমতাবস্থায় কি তারা সোয়েটার কিংবা গরম কাপড় পরার জন্য অপেক্ষা করবে, না কি মেহমান এসে পড়েছে জেনে এমনিতেই বিছানা ছেড়ে দৌড়ে যাবে? তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিয়ে মেহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না? যার সঙ্গে মুহাব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার বেলায় আদৌ কালক্ষেপণের প্রশ্ন ওঠে না। যখনই ডাকা হবে, যখনই বলা হবে, সব কাজ রেখে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহীয়সী স্ত্রীগণের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের মনোতুষ্টির জন্য কিচ্ছা-কাহিনী শোনাতেন। কিন্তু যখনই আযান শুনতেন, তখন এই অবস্থা হত যে, তাঁরা বলেন, كانه لا يعرفنا যেন তিনি আমাদেরকে চিনতেনই না। একদিকে আযান শুনেছেন, অন্যদিকে দরবারে ইলাহিতে হাজিরা দেয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত।

ভয় বা ভালোবাসায় কাজ হয়ে যায়

এখন কথা হল, ভয়-ভীতি বা ভালোবাসায় যাই হোক, কাজ হয়ে যায়। বহু ড্রাইভারকে দেখা যায়, তারা যাত্রীদের সথে আলাপ করে চলেছে, কিন্তু যখনই ট্রাফিক সিগন্যাল তুলে নেয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দেয়। যাত্রীরা উঠে বসল কি বসল না, সে দিকে কোন খেয়াল নেই। কারণ, এখানে ভয়-ভীতি বর্তমান।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন, পানাহারে যে সময়টুকু বিনা লেখাপড়া ব্যতীত হয়, এর জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.)-এর জীবনে এমন একটি জমানা অতিবাহিত হয়েছে যখন তিনি এত বেশি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন যে, পানাহারও করতেন না। তার বোন লোকমা বানিয়ে মুখে তুলে দিতেন। নিজে খেলে সময় বেশি ব্যয় হবে, অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটবে, তাই এ ব্যবস্থা। মূল কথা হল, যখন ভালোবাসা হয়ে ওঠবে, কারো সঙ্গে সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে ওঠবে, তখন কোন কিছুর পরোয়া করা হবে না। অন্তর শুধু তার প্রতি নিবিষ্ট থাকবে।

আল্লাহর মহব্বত লাভের উপায়

এখন কথা হল, আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে কিভাবে? আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার চারটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নিবে। প্রতিদিন নিয়মিত কিছু সময় একাকিত্বে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে। কালিমা শরীফ, দরূদ শরীফ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার- এ সবের মধ্য থেকে যা ভালো লাগে, তা পড়বে। এতে করে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা হয়। বলা হয়েছে- انا جليس من ذكرني যে আমার যিকির করে, আমি তার সঙ্গী হই। আমরা হজে আসি; কেউ আসি বিমানে উড়ে, কেউ আসি স্টিমারে চড়ে, আবার কেউ অন্যভাবেও এসে থাকি। এমতাবস্থায় যদি আমরা চুপচাপ বসে থাকি, তা হলে একের সঙ্গে অন্যের পরিচয় ও সম্পর্ক একদম হবে না। কিন্তু যেখানে পরস্পর পরিচয় হয়, আলাপ-আলোচনা হয়, একের সঙ্গে অন্যের জানাশোনা হয়, সেখানে পরস্পর যোগসূত্র সৃষ্টি

হয়, মুহাব্বতপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন যতই আলাপ-আলোচনা চলবে, সম্পর্ক গাঢ় হবে। এমনিভাবে যখন যিকির করবে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলবে, তখন সম্পর্ক গাঢ় হবে, ভালোবাসা প্রগাঢ় হবে। এই গেল আল্লাহর মহব্বত লাভের প্রথম পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করবে যে, তিনি আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন। অন্য কোন জীব-জানোয়ার বানালে কী করার ছিল? শুধু মানুষই নয়, বরং মুসলমানও বানিয়েছেন। ভাববার বিষয় হল, তিনি কতককে আগে থেকেই মুসলমান বানিয়েছেন। এর উপর আরও অসংখ্য নিয়ামত প্রদান করেছেন। হারামাইনে হাজির হওয়ার নিয়ামত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং একে আপন গৃহ আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত নিয়ামতের প্রতি লক্ষ কর। তিনি সুস্থতা দান করেছেন। হাত-পা, চোখ-কান সচল ও সবল রেখেছেন, আত্মীয়-স্বজন দিয়েছেন। মোটকথা, সবসময় তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা ফিকির করবে। এতে করে মুহাব্বত বাড়বে এবং সম্পর্ক প্রগাঢ় হবে। এই গেল আল্লাহর মহব্বত লাভের দ্বিতীয় পদ্ধতি।

আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভের তৃতীয় পদ্ধতি হল, দীনের যে কোন কাজ এই নিয়তে করবে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বত প্রগাঢ় হবে। সালাম করবে, মুসাফাহা করবে, তিলাওয়াত করবে এজন্য যে, এতে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত গাঢ় হবে। ওয়াজ-নসীহত, দরস ও তাদরিসসহ যে কোন দীনি কাজ কর, এই নিয়তে করবে যে, এতে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতে তারক্কি হবে। এ বিষয়ে ফিকির ও গুরুত্ব প্রদান করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভের তিনটি উপায় বলা হয়ে গেছে। আল্লাহর মহব্বত লাভের চতুর্থ উপায় হল, দু'আর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এবং অন্যান্য সময়ে গুরুত্বসহকারে দু'আ করবে। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র দু'আ বর্ণিত আছে-

اللهم انى اسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذى يبلغنى حبك

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে আপনার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং সে সকল লোকের ভালোবাসা যারা আপনাকে ভালোবাসে আর এমন কাজের প্রতি আমার মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিন, যার দ্বারা আপনার ভালোবাসা হাসিল হবে। -তিরমিযী, মিশকাত - ১/২১৯

দু'আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কায়মনোবাক্যে দু'আ-প্রার্থনা করতে থাকবে। দু'আ কবুল হল কি হল না এ ব্যাপারে মোটেই তাড়াহুড়া করবে না। আমাদের সন্তানেরা কিছু চাইলে একবারেই কি আমরা তাদের চাহিদা পূরণ করে দিই? না, বরং বার বার অনুনয়-বিনয় করলে পরে তাদের আবদার পূরণ করে দেই। এখানেও অনুরূপ হয়ে থাকে। বান্দার এই দায়িত্ব যে, সে নিয়মিত দু'আ-প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা চান তো দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে যত্নবান হলে, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর মুহাব্বতে উন্নতি সাধিত হবে। মুহাব্বত কামেল ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবে। এরপর কী অবস্থা হবে? প্রেমাস্পদের আচরণ যা হওয়ার তাই হবে।

সারকথা

এ আলোচনার সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা হয়ে উঠার জন্য নিজের মধ্যে এসব গুণাবলীর সমন্বয় ঘটাতে হবে এবং সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এর ভিত্তি এই যে, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ মুহাব্বত সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় করে নিতে হবে। সংক্ষিপ্তভাবে যার পদ্ধতি ইতোমধ্যে বলে দেয়া হয়েছে। আহলুল্লাহর সোহবত ও সংস্রব এবং তাদের মজলিসে অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা এ ধারা ও তরিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্তর যখন তৈরি হয়ে যাবে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তখন আল্লাহওয়ালার যে বিশেষত্ব আছে, তার যে বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আছে, তাও এসে পড়বে এবং মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যভাজন হয়ে যাবে।

যা কিছু বলা হল, আল্লাহ তা'আলা এসব কথা কবুল করে নিন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর পরিপূর্ণ ভালোবাসা নসিব করে খাস বান্দা বনার তাওফিক দান করুন। আমীন!

গ্রন্থপঞ্জি

কুরআনুল কারীম □

তাফসীরে নূরুল কুরআন □

তাফসীরে কাবীর □

সহীহ বুখারী শরীফ □

সহীহ মুসলিম শরীফ □

তিরমিযী শরীফ □

আবু দাউদ শরীফ □

ইবনে মাজা শরীফ □

বাইহাকী শরীফ □

আত্ তারগীব ও তারহীব □

জামে সগীর □

কানজুল উম্মাল □

মিশকাত শরীফ □

মিরকাত শরহে মিশকাত □

শামায়েলে তিরমিযী □

ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন □

কিয়ামূল লাইল □

মাওয়ায়েজে আবরার □